ISSN-0971-8397

যোজনা

ধনধান্যে

এপ্রিল ২০১৫ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ১০

উৎপাদন শিল্প : বিকাশ ও চ্যালেঞ্জ

ভারতীয় উৎপাদনশিল্পের নতুন প্রেক্ষিত ও অপরিহার্যতা
পি এম ম্যাথ্যু

উৎপাদনকেন্দ্রিক বিকাশ, প্রতিযোগিতা এবং চ্যালেঞ্জ
অরূপ মিত্র

ভারতীয় উৎপাদনশিল্পকে পরিবেশবান্ধব করে তুলতে প্রয়োজন উদ্ভাবন
বালকৃষ্ণ সি রাও

শ্রম-আইন ও ভারতের উৎপাদনক্ষেত্র : সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা
দেবাশিস মিত্র

বিশেষ নিবন্ধ

আইনি সহায়তা এবং আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা
মনোজ কুমার সিন্‌হা

এ রাজ্যে আলু চাষের হাল হকিকত
শান্তি মল্লিক

The story of a Man
who became a Mahatma
Read Our Books

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

যোজনা ? কুইজ

১. বিজ্ঞানের ‘এন্টোমোলজি’ নামক শাখায় কোন বিষয় নিয়ে চর্চা করা হয়?

২. পৃথিবীর বৃহত্তম রেল স্টেশন কোন শহরে অবস্থিত?

৩. এরিট্রিয়া নামক দেশটি কোন মহাদেশের অঙ্গ?

৪. গরমপানি অভয়ারণ্য ভারতের কোন রাজ্যে?

৫. ‘এফ এফ সি’ বলতে আমরা কী বুঝি?

৬. লুই ওয়াশক্যানস্কির হৃদয় প্রতিস্থাপন (হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট)-কেই সর্বপ্রথম মানব হৃদয় প্রতিস্থাপন বলে গণ্য করা হয়। এই অস্ত্রোপচার কে করেন?

৭. ‘গাল্‌ফ কো-অপারেশন কাউন্সিল’-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কোন কোন দেশ?

৮. গল্‌ফ খেলোয়াড় বিজয় সিং কোন দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন?

৯. অলিম্পিক ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে কোন খেলা ২৮ মিটার × ১৫ মিটার এলাকার মধ্যে খেলা হয়?

১০. প্রত্যেক বছর কোন দিন বিশ্ব ‘রেড ক্রস’ ও ‘রেড ক্রেসেন্ট’ দিবস পালিত হয়?

১১. ফেডারেশন কাপ, বিশ্ব কাপ, অলউইন আন্তর্জাতিক ট্রফি এবং চ্যালেঞ্জ কাপ—এই সব ক’টি টুর্নামেন্ট কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত?

১২. গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের এক্তিয়ার কত দূর পর্যন্ত প্রসারিত?

১৩. SODAR কী?

১৪. রসায়নে দু-দু বার নোবেল পুরস্কার কে পেয়েছেন?

১৫. ‘জ্যামিতির জনক’ কাকে বলা হয়?

উত্তর :

১. কীট-পতঙ্গ। ২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে। পার্ক এভেন্যুর গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল। ৩. আফ্রিকা। ১৮২তম সদস্য হিসেবে ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রসংঘে যোগ দেয়। ৪. আসাম। দিফু। ৫. ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশন। ৬. ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড। ১৯৬৭ সালে। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে। ৭. বাহরেন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ৮. ফিজি। তাঁকে ‘দ্য বিগ ফিজিয়ান’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ৯. বাস্কেটবল। ১০. মে ৮। ১১. ভলিবল। ১২. আসাম-সহ অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড ও মিজোরাম রাজ্যগুলিও এই ন্যায়ালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত। এছাড়াও ইটানগর, কোহিমা ও আইজওয়ালে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জন্য (যথাক্রমে) ‘বেঞ্চ’ স্থাপন করা হয়েছে। ১৩. ‘সনিক ডিটেকশন অ্যান্ড রেঞ্জিং’। আবহ পরিমাপের বিশেষ যন্ত্র। এগারোতম অ্যান্টার্কটিক অভিযানের (নভেম্বর ১৯৯১-মার্চ ১৯৯২) সময় স্থাপন করা হয়। ১৪. ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার। ইনসুলিন-এর আণবিক গঠন আবিষ্কার করার জন্য ১৯৫৮ সালে এবং ১৯৮০ সালে ‘ডিএনএ’-এর মূল অনুক্রমগুলি (বেস সিকোয়েন্স) নির্ধারণ করার জন্য নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে রসায়নে নোবেল পুরস্কার জয় করেন। ১৫. অ্যালেক্সজান্ড্রিয়ার ইউক্লিড। এই গ্রিক গণিতজ্ঞ প্রথম প্লোটেমির শাসনকালে (৩২৩-২৮৩ খ্রিস্টপূর্ব) সক্রিয় ছিলেন।

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 10.00

APRIL, 2015
R.N.I. No. 19740/6

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐☐☐☐☐☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

এপ্রিল, ২০১৫

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদনায় : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ভারতীয় উৎপাদনশিল্পের নতুন প্রেক্ষিত ও অপরিহার্যতা — পি এম ম্যাথ্যু ৫
- উৎপাদনকেন্দ্রিক বিকাশ, প্রতিযোগিতা এবং চ্যালেঞ্জ — অরূপ মিত্র ১১
- ভারতীয় উৎপাদনশিল্পকে পরিবেশবান্ধব করে তুলতে প্রয়োজন উদ্ভাবন — বালকৃষ্ণ সি রাও ১৩
- শ্রম-আইন ও ভারতের উৎপাদনক্ষেত্র: সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা — দেবাশিস মিত্র ১৬
- ভারতের আর্থিক বিকাশ ও উৎপাদনমুখী শিল্পের হকিকতনামা — ড. প্রদীপ্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান: পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা — উৎপল চক্রবর্তী ২৬
- মেক ইন ইন্ডিয়ার জন্য বিশ্বজনীন উৎপাদন নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ — সি বীরামণি ৩০
- ভারতের উৎপাদনক্ষেত্র, উদ্যোগ-বৈচিত্র ও কর্মসংস্থান — ভব রায় ৩৩
- অশোধিত তেলের মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে — হিরণ্ময় রায়, অনিল কুমার ও বিজয় শেখাওয়াত ৩৭

বিশেষ নিবন্ধ

- আইনি সহায়তা এবং আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা — মনোজ কুমার সিন্‌হা ৪০
- এ রাজ্যে আলু চাষের হালহকিকত — শান্তি মল্লিক ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ডায়েরি — সংকলক: পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৪৫
- জানেন কি? (ডাক পরিষেবায় নাগরিক অধিকার) — মলয় ঘোষ ৫০
- প্রতিযোগিতা প্রস্তুতি (গবেষণার জন্য বৃত্তি) — মহুয়া গিরি ৫২
- যোজনা কুইজ — পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী তৃতীয় প্রচ্ছদ

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

বিকাশের জন্য বড় সুযোগ

যে কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎপাদনশিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মতো বিকাশশীল দেশ আর্থিক বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য অনেকটাই নির্ভর করে উৎপাদনশিল্পের উপর।

ভারতীয় অর্থনীতি প্রধানত কৃষি-ভিত্তিক। বর্তমানে এদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে উৎপাদনক্ষেত্রের অবদান ১৬ শতাংশ এবং এর প্রসার আরও বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে। তা সত্ত্বেও বিকাশে তথা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উৎপাদনশিল্পের ভূমিকা এখনও পূর্ণমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী অনমনীয় শ্রম-আইন, কর্মীদের মধ্যে দক্ষতার অভাব এবং উদ্ভাবনমূলক প্রযুক্তির অভাব ইত্যাদি।

আমাদের দেশের সম্পদের বৈচিত্র এবং শ্রমবাহিনীর দক্ষতা ও যোগ্যতার রকমফের এমনই যে বড়, ছোট সব ধরনেরই শিল্পোদ্যোগের গুরুত্ব বোঝা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্র বহুলাংশে আমাদের পরম্পরাগত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। এই উপক্ষেত্রই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার নিরিখে কৃষির পর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এইভাবে দারিদ্র দূরীকরণ এবং আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনে ক্ষুদ্র শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে বৃহৎ শিল্পোদ্যোগগুলি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি-বিকাশের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে এবং দেশজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে সার্বিক উন্নয়নের পথ আরও প্রশস্ত করতে সাহায্য করে।

যোজনা

এক দশকের মধ্যে জিডিপি-তে উৎপাদনশিল্পের অংশভাগ বাড়িয়ে ২৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া এবং ১০ কোটি নতুন চাকরি সৃষ্টি করাই হচ্ছে জাতীয় উৎপাদনশিল্প নীতির লক্ষ্য। এই নীতির আরেকটি উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ যুব সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন। এর জন্য প্রয়োজনমাফিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা ও কর্মোপযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে। গোটা বাণিজ্যিক ব্যবস্থাটিকে সহজ, সরল, ত্রুটিমুক্ত ও ডিজিটাইজ করে দেশি ও বিদেশি উভয় প্রকার শিল্পের জন্য অনুকূল, শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা এবারের বাজেটে ঘোষিত হয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'স্কিল ইন্ডিয়া', 'মুদ্রা' ব্যাংক প্রভৃতির উদ্দেশ্য উদ্যোগীদের উৎসাহ জুগিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে ভারতকে গড়ে তোলা। এছাড়াও উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, শক্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির প্রতি যথাযথ গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সমস্যার মোকাবিলার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথাও বাজেটে বলা হয়েছে।

উৎপাদনশিল্পের বিকাশের জন্য এ পর্যন্ত ভারতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং আরও কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন এই সংখ্যার নিবন্ধগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, উৎপাদনশিল্প ভারতকে পৃথিবীর দ্রুততম বিকাশশীল অর্থনীতি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জন করতে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এই স্বপ্ন সত্যি করতে প্রয়োজন সরকার এবং শিল্পমহলের দৃঢ় অঙ্গীকার ও যৌথ প্রয়াস।❑

ভারতীয় উৎপাদনশিল্পের নতুন প্রেক্ষিত ও অপরিহার্যতা

কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না, কিন্তু প্রতি বছর শ্রমের বাজারে যুক্ত হচ্ছে ১২.৮ মিলিয়ন নতুন শ্রমিক। সুতরাং প্রয়োজন উৎপাদনশিল্পকে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া, কারণ এই শিল্পের প্রসারের মাধ্যমেই উদ্বৃত্ত শ্রম নিযুক্ত করা সম্ভব। অথচ উৎপাদনশিল্পের অবদান আমাদের দেশে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে যেখানে ১৭ শতাংশ, চীনে তা ৩৩ শতাংশ। এ ব্যাপারে প্রয়োজন যথাযথ নীতি প্রণয়ন করা, পুরোনো প্রকল্পগুলি খুঁটিয়ে দেখা, দক্ষতা বাড়ানো, উদ্যোগ-নির্ভর প্রকল্প গড়ে তোলা বেশি জোর দেওয়া বেসরকারি উদ্যোগের উপর, সুসংহত মেধাসত্ব আইন চালু করা এবং পরিকাঠামোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন **পি এম ম্যাথ্যু।**

ভারতে উৎপাদনশিল্প সেভাবে বেড়ে না ওঠায় এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর। দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের গরিব থাকার একটি অন্যতম কারণ হল কৃষিক্ষেত্রের মূল্য-সংযুক্তির সঙ্গে দেশের শ্রম-বণ্টনের সামঞ্জস্য না থাকা। সুতরাং প্রয়োজন সংশোধন, অর্থাৎ উৎপাদনশিল্পকে গুরুত্ব দেওয়া। উৎপাদনশিল্পকে স্পঞ্জের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যেখানে কৃষি থেকে আসা উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা সহজেই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিশ্বায়নের যুগে রপ্তানি ক্ষেত্রে বাড়তি প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। ভারতকে অবশ্যই চীনের উৎপাদনশিল্পের কাছাকাছি আসার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, যেখানে তাদের একদিকে রয়েছে কম মজুরির শ্রমশক্তি এবং সেই সঙ্গে এই সব শ্রমিকের দক্ষতাও রয়েছে যথেষ্ট। আমাদের দেশে জিডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন)-তে উৎপাদনশিল্পের অবদান ১৭ শতাংশ, সেখানে চীনে এই অবদান ৩৩ শতাংশ, কোরিয়ায় ২৯ শতাংশ, ব্রাজিলে ২৫ শতাংশ এবং থাইল্যান্ডে ২৭ শতাংশ। সম্পদের ক্ষেত্রে আমাদের অপ্রতুলতা রয়েছে, অপ্রতুলতা রয়েছে পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও। বিনিয়োগকারীরা উন্নত পরিকাঠামো আশা করে থাকেন এবং এই সব দুর্বলতার কারণেই উৎপাদনশিল্পে বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে। তবে সম্প্রতি যা গতি-প্রকৃতি তাতে মোটর গাড়ি এবং মোটর গাড়ি যন্ত্রাংশ নির্মাণ, রসায়ন, জেনেরিক ওষুধ, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদেশি উৎপাদন সংস্থার বিনিয়োগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত দু'টি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি অর্থাৎ 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'স্কিল ইন্ডিয়া'-র তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে।

প্রসঙ্গত, চীনের জিডিপি-র পরিমাণ ভারতের চেয়ে ৩.৮ গুণ বেশি, কিন্তু উদ্বেগের বিষয় যে, ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি (মেশিন টুল্‌স) নির্মাণের ক্ষেত্রে চীনের উৎপাদনের পরিমাণ ভারতের চেয়ে ৫৫ গুণ বেশি। মনে রাখতে হবে এই সব যন্ত্রপাতিই হল উৎপাদনশিল্পের মূল ভিত্তি, যাকে বলা হয় উৎপাদনশিল্পের 'মাদার ইন্ডাস্ট্রিজ'। ভারতকে এমন একটা নীতি প্রণয়ন করতে হবে যাতে বছরে অন্তত ১২ থেকে ১৪ শতাংশ হারে উৎপাদনশিল্পে বৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হতে পারে এবং আগামী ১৫ বছরে এই শিল্পে ১০ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। ভারতে রয়েছে এক বিরাট সংখ্যক তরুণ ও যুব সম্প্রদায় যাদের এই সব শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে দেশ লাভের কড়ি ঘরে তুলতে পারে। এর ফলে দেশের মূলধনি সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে গতি আসবে এবং নতুন উদ্ভাবনের ফলে উৎপাদনশিল্প প্রতিযোগিতামুখী হয়ে উঠবে। এইভাবে শিল্পের স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। উৎপাদন-শিল্পের বেড়ে ওঠার পরিকল্পনার সঙ্গে এক উদ্ভাবনীমূলক ব্যবস্থাপত্রের সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। এ জন্য এত দিনের চলে আসা নীতি থেকে পুরোপুরি সরে দাঁড়ানো প্রয়োজন।

প্রতিযোগিতামুখী উৎপাদনশিল্প : সংজ্ঞা ও পরিধি

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়। প্রতিযোগিতা-সহায়ক অর্থনীতি দেশের অর্থ-চক্রের শ্লথগতি রদ করতেও সক্ষম হয়। এর ফলে ভবিষ্যতে অর্থনীতির দৃঢ় হয়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF) প্রতিযোগিতাশীলতার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বলেছে, 'এটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নীতি এবং উৎপাদকের সমষ্টি যার ফলে দেশের উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা যেতে পারে।' অন্য দিকে উৎপাদনশীলতার মাত্রাটি দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নের মাপকাঠি নিরূপণ করে। অর্থাৎ অর্থনীতি বেশি বেশি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হলে দেশের নাগরিকদের আয়ের পরিমাণও বেড়ে যায়।

উদ্যোগের মাত্রা ও প্রতিযোগিতা

উৎপাদনশিল্পের ক্ষেত্রে এতদিনের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল উচ্চ-মানের প্রযুক্তি এবং বৃহৎ উদ্যোগ। নানা স্তরের আলোচনাতেও বৃহৎ উৎপাদনশিল্প ঘিরে এক ধরনের 'হেজিমনি' (একপেশে কর্তৃত্ব) তৈরি

হয়েছিল এবং ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলির স্থান ছিল শেষের সারিতে। কিন্তু বর্তমানের উদীয়মান অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলির (MSME সেক্টর) প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ বাড়ছে।

আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৫০ শতাংশের বেশি ক্ষুদ্র উদ্যোগ এক বছরের মধ্যেই ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং বাকিদের মধ্যে ৯৫ শতাংশকে ব্যবসা গোটাতে হয় পাঁচ বছরের মধ্যে। ব্যবসায় সফলতা না আসার চিরাচরিত কারণগুলি, যেমন উদ্যোগপতিদের অনভিজ্ঞতা, স্থান পছন্দের ত্রুটি এবং মূলধনের অভাব, এগুলি ছাড়াও যে জিনিসটি চোখের আড়ালেই থেকে যায় সেটি হল তাঁদের আত্মসন্তুষ্টি। প্রায়শই দেখা যায়, একটু মোটামুটি সফলতা অর্জন করতে পারলেই তাঁরা আত্মতুষ্টির শিকার হন, এর ফলে উৎপাদন এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে হয় আর তার নিট ফল দাঁড়ায় বিক্রি কমে যাওয়া। সুতরাং প্রয়োজন ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালানো যাতে উৎপাদন এবং শিল্পের গুণমান বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণের প্রেক্ষিতে উৎপাদনশিল্পের প্রতিযোগিতার বিষয়টির ওপর পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া সব কিছুতেই পারদর্শিতার বিষয়টা এসে যাওয়ায় এই প্রতিযোগিতা আবার একটা নতুন মাত্রা পেয়ে গিয়েছে। উৎপাদনশিল্প বর্তমানে নির্দিষ্ট কোনও স্থান-নির্ভর নয় এবং এ ব্যাপারে এর ভালো এবং মন্দ দু' দিকই রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় যে উৎপাদন প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছে সেখানে প্রকল্পের ব্যয়ের দিকটি গুরত্বপূর্ণ। সুতরাং উৎপাদনশিল্পটি কোন জায়গায় গড়ে উঠবে, বাজারের অবস্থাটা কীরকম দাঁড়াবে এবং উৎপাদনটাই বা কী পরিমাণে হবে, এগুলি সবই উৎপাদনশিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই প্রতিযোগিতার আবহে উৎপাদনশিল্পকে সফলভাবে প্রতিযোগিতামুখী হয়ে উঠতে হলে প্রয়োজন সব সময় নতুন উদ্ভাবনার সন্ধান করা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিকেও গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন রয়েছে। উদ্যোগটি কি সম্প্রসারিত বাজারের কথা বিবেচনা করেছে অথবা কেবলমাত্র স্বল্পকালীন লক্ষ্যের দিকটাই মাথায় রেখেছে, যেমন কর্মচারীদের চাকরি রক্ষা করা। উৎপাদনশিল্পে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি। মনে রাখতে হবে বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতা অনেক সুযোগও এনে দিয়েছে, যেমন নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করার সুযোগ, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

উৎপাদনশিল্পে প্রতিযোগিতা

অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প যে উৎপাদন-ক্ষেত্রে মেরুদণ্ড তা কেবলমাত্র ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য সারা পৃথিবীতেই। সুতরাং এই সব শিল্পের প্রতিযোগিতা বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি, কারণ এর ফলেই উৎপাদনশিল্পের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বাড়বে জাতীয় আয়। 'সম্মিলিত দক্ষতা'-র ক্ষেত্রে এক দশকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানা যায়, এই মডেল কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন গুচ্ছ-শিল্পের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব হলেও এর ফলে সারা দেশের উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যে সব ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প একক ভিত্তিতে উৎপাদন করে, প্রতিযোগিতা দুনিয়ায় নতুন করে তাদের অবস্থান নির্ণয় করতে হবে এবং প্রয়োজনে নিজেদের সাংগঠনিক কাঠামোটিকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। এই সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি নতুন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এক সর্বাত্মক সাড়া জাগাতে পারে। এখানেই জন্ম নেয় নতুন নতুন উদ্ভাবনা ও নতুন নতুন প্রযুক্তি। এখান থেকেই বড় বড় কোম্পানিতে প্রযুক্তির চালান ঘটে। সুতরাং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য এদের উৎসাহিত করা জরুরি। ইনস্টিটিউট অব স্মল এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ISED)-এর গবেষণা থেকে জানা যায়, বিভিন্ন মন্ত্রকের একাধিক কর্মসূচি ও প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও তারা কেউই এগুলির থেকে বিশেষ ফায়দা তুলতে পারেনি। সুতরাং প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তন।

প্রতিযোগিতার মুখে বাড়তি সুবিধা পেতে হলে প্রয়োজন প্রযুক্তি, পরিচালন এবং পরিকল্পনার সার্বিক সন্নিবেশ ঘটানো। কিন্তু এই সব ছোট উদ্যোগের পক্ষে এই জটিল কাজ করে ওঠা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে তাদের বাইরের কোনও পরাদর্শী সংস্থারই শরণাপন্ন হতে হবে। বাজারজাত করার ক্ষেত্রে সময় কমিয়ে আনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ সংস্থার তৈরি পরিকল্পনা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং এগুলি তাদের কার্যকর করতে হবে।

প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন বৃদ্ধি

এই সহস্রাব্দে উদ্যোগের বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক মত রয়েছে। বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে যে মতটা গৃহীত হয় সেটি হল, সরকারকেই উন্নয়নের কাজে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। অবশ্য শিল্পোন্নত দেশগুলিতে নতুন উদ্ভাবনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

জিডিপি-র অনুপাতে গবেষণা ও উন্নয়নের (R & D—রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) খাতে খরচ এ ব্যাপারে একটি দিগ্‌নির্দেশক। ভারতের অবস্থা দীর্ঘ পর্যালোচনা করা হয়েছে। যুক্তি দিয়ে বলা হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে যে সব পরিসংখ্যান রয়েছে তাতে বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত খরচের ক্ষেত্রে দেশ অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। ভারতের মাত্র চারটে কোম্পানি পৃথিবীর সর্বোচ্চ এক হাজার পাবলিক কোম্পানির তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছে এবং এই চারটে কোম্পানিই গবেষণা ও উন্নয়নের খাতে খরচের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়। সামগ্রিক চিত্রটাই যখন এরকম, তখন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে অবস্থাটা উৎসাহজনক নয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এদের উৎপাদিত সামগ্রী বহুমুখী, কিন্তু গবেষণাখাতে এদের খরচের পরিমাণ যৎসামান্য। মেধাসত্ত্ব সংক্রান্ত ISED-র গবেষণায় (২০০৯) এসব তথ্য বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে প্রতিদিনই পৃথিবীতে নতুন নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। তবে বৃহত্তর প্রশ্ন হল অন্যান্য

সংস্থাগুলির বেআইনিভাবে এই সব আবিষ্কার তাদের নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে কি না। এই কাজে লাগানোর ক্ষেত্রটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে; (ক) বাধ্যতামূলক এবং (খ) অনুমতিসাপেক্ষ।

দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে নানান ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই সব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে স্থানীয় স্তরে এবং দক্ষতার তাৎপর্য বিশদভাবে অনুধাবন না করে। দক্ষ মানব সম্পদই কোনও দেশের অর্থনীতিকে আরও বেশি উৎপাদনশীল, প্রতিযোগিতামুখী এবং উদ্ভাবনী করে তুলতে পারে। অর্থনীতির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রসঙ্গটিও সমান জরুরি। বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আর্থিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দিয়েছে। এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে সামাজিক ব্যয় ও বিচ্যুতি কমিয়ে আনতে কোনও দেশের দক্ষতার মানদণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সব দেশের উচ্চ-মানের দক্ষতা রয়েছে তারা সহজেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ভারতে কর্মসংস্থানের সমস্যাটি বিশাল এবং সেই সঙ্গে রয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে দক্ষতার এক অসম বণ্টন। প্রয়োজন বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে দেড় বছর পূর্বে একটি প্রকল্প চালুও হয়েছিল—টারগেট গ্রুপ ছিল প্রশিক্ষণ-বিহীন ও যৎসামান্য প্রশিক্ষণ থাকা অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৯৩ শতাংশ দক্ষ এবং আধা দক্ষ শ্রমিক। ২০২০ সালের মধ্যে দেশ বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ২.৫ মিলিয়ন আসনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যমাত্রাও হাতে নেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে প্রতি বছর দেশের শ্রমক্ষেত্রে ১২.৮ মিলিয়ন নতুন শ্রমিক যুক্ত হচ্ছে।

২০২০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীতে ৫৪০ মিলিয়ন দক্ষ মানুষের প্রয়োজন, যাঁরা হবেন অতি-দক্ষ এবং দক্ষ। এঁদের মধ্যে যেমন থাকবেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পরিচালক সেরকম থাকবেন আধা দক্ষ মানুষজনও। এই সব মানুষের ৫০ শতাংশই ভারতীয় হবে। দেশ থেকে মানুষের বিদেশে পাড়ি জমানোর ফলে আমাদের দেশেই দক্ষ মানুষের অভাব দেখা দেবে। কারণ শ্রমিকদের অভিবাসনের ফলে সার্বিকভাবে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা কমে আসবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আঘাতটা বেশি আসবে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির উপর, কারণ এই ক্ষেত্র থেকে কর্মরত দক্ষ শ্রমিকরা যেমন অন্যত্র পাড়ি জমাবে, সেরকম নতুন দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যেও এই উদ্যোগগুলিতে ভিড় জমাতে অনীহা দেখা দেবে। এর ফলে এই সব উদ্যোগে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পাবে এবং লাভাংশ কমার কারণে উদ্যোগগুলির অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। সুতরাং দক্ষতার ক্ষেত্রে এই শূন্যস্থান পূরণ করতে স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে যা আগের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং জাতীয় স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুমুখী 'স্কিল ইন্ডিয়া' (দক্ষ ভারত) প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রীয় বাজেটেও প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে। লক্ষ্য হল দেশের যুব সম্প্রদায়কে দক্ষ করে তুলে তাদের কর্মোপযোগী করে তোলা। এ ছাড়া দেশে চিরাচরিত যে সব কাজগুলি রয়েছে, যেমন ছুতোরের কাজ, জুতো সেলাই, রাজমিস্ত্রির কাজ, কামারের কাজ, তাঁতের কাজ এগুলির ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এই সব পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের আরও দক্ষ করে তোলার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আগে থেকে চালু থাকা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প একত্রিত করারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। 'স্কিল ইন্ডিয়া' হল সরকারি নীতির মাধ্যমে শ্রমের বাজারে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিশারি। উদীয়মান অর্থনীতিতে কাজের সুযোগ থাকে যথেষ্টই আর সরকারের নীতি হল এই সুযোগকে কাজে লাগাতে দক্ষতা বাড়িয়ে তোলা। সরকারের নীতির পরিবর্তনের মূল সুরটা হল বেসরকারি ক্ষেত্রের উন্নয়নের উপর বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া।

২০১৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট এক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে সব চেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে কর্মমুখী দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর। আশা করা যায় এর ফলে 'পিরামিড'-এর নীচের স্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। বাজেটে পরিকাঠামো, শক্তি, উৎপাদনশিল্প, 'স্বচ্ছ ভারত', 'স্বচ্ছ গঙ্গা', ডিজিটাল ভারত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর অর্থ হল কর্মমুখী প্রশিক্ষণকে হাতিয়ার করে শিল্পক্ষেত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ কর্মীদের প্রস্তুত করা। 'স্কিল ইন্ডিয়া' ও 'ন্যাশনাল স্কিল মিশন'-এর মাধ্যমে ৩১টি শিল্পক্ষেত্রের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে সংযোজিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ গড়ে তুলতে কোনও একটি সংস্থার উচিত পরিচালনা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা, সাংগঠনিক ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস করা এবং সেই সঙ্গে অর্জিত জ্ঞান হস্তান্তরের নতুন উপায় উদ্ভাবন করা। প্রয়োজন এক নতুন নীতির আবহ গড়ে তোলা যা নতুন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এবং মেধাসত্ত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠবে। এছাড়াও প্রয়োজন গবেষণার উপর জোর দেওয়া এবং দেশের গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে জ্ঞানভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা। উৎপাদন সংস্থা গড়ে তুলতেই এ ধরনের প্রচেষ্টার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। একই সঙ্গে ব্যবসায়িক সংগঠনগুলিকে বিশেষ করে MSME ক্ষেত্রকে মেধাসত্ত্বের বিষয়টিকেও মাথায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে তাদের নিজেদের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণাগুলিকে সঠিকভাবে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হয়।

যদিও মেধাসত্ত্বের গুরুত্ব এখন সর্বজনস্বীকৃত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে এই গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধ হওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ বিষয়টির জটিলতা সাধারণ উদ্যোগপতির পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। এছাড়া সংস্থাটি ছোট হওয়ায় এবং বাজারের দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় এই বিষয়টির উপর মনোযোগ কমই থাকে। কিন্তু

মেধাসত্ত্বর সুরক্ষার বিষয়টি বর্তমানে যথেষ্টই জরুরি হয়ে উঠেছে, কারণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের চিরাচরিত ক্ষেত্রগুলিকে বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলি ক্রমশ কবজা করে নিতে চাইছে। এই অনুপ্রবেশের নিরিখে মেধাসত্ত্বের বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

উদ্যোগ-সংক্রান্ত নীতি

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নীতিগুলির মধ্যে যে সব সরকারি স্বনিযুক্তি কর্মসূচি রয়েছে, সেগুলিকে সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই সব নীতির মূল কথা হল বড় বড় উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে ছোট উদ্যোগগুলিকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তাতে খানিকটা প্রলেপ দিতে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংক্রান্ত নীতিতে ক্ষুদ্র উদ্যোগের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, উদ্যোগপতির ওপর নয়। দ্রুতগতিতে প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় যখন একটা অনিশ্চয়তার আবহ তৈরি হয় তখন বাজার সংক্রান্ত সঠিক সংকেত পেলে উদ্যোগপতিরা কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ব্যবসা বাড়িয়ে নিতে পারে। সারা দুনিয়ায় এটা ক্রমশ উপলব্ধি করা হচ্ছে যে ছোট উদ্যোগের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হলেও এবং অনুকূল সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা হলেও তা প্রচুর সংখ্যায় উদ্যোগ গড়ে তোলা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং প্রতিযোগিতামূলক স্থিতিশীল আবহ সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট নয়।

ভারতের অর্থনীতির উদ্যোগ-নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের অগ্রগতি পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। এর জন্য কর্মপন্থা উদ্ভাবনের প্রয়োজন রয়েছে। জাতীয় উদ্যোগ-সংক্রান্ত (অন্ত্রপ্রেনরশিপ) নীতির রূপায়ণের লক্ষ্যে কেবলমাত্র একটি মন্ত্রকের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে চলবে না। বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে প্রয়োজন বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এ ব্যাপারে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে স্থানীয় পর্যায়ে শক্তপোক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ছাড়া এভাবে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। প্রয়োজন যুব নেতৃত্ব যারা এই উদ্যোগ-নির্ভর অর্থনীতির স্বরূপ ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে এবং দেশের অর্থনীতির রূপান্তর ঘটাতে পারবে। উৎপাদনশিল্পে প্রতিযোগিতার প্রেক্ষিতে 'ন্যাশনাল অন্ত্রপ্রেনরশিপ পলিসি' ঘোষণার এটিই হল সঠিক সময়।

বিশ্বায়নের প্রসারের ফলে স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির সঙ্গেও ক্রমশ আন্তর্জাতিক অর্থনীতির মেলবন্ধন ঘটছে। বাজারের এই ব্যাপ্তির প্রেক্ষিতে এগিয়ে যাবার কৌশল হল ব্যবসাটাকেই বেশি গুরত্ব দেওয়া। সুতরাং স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগগুলিকে তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড গঠন করতে হবে অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোনও উদ্যোগের সঙ্গে যোগসাজশ গড়ে তুলতে হবে এবং এর ফলেই প্রতিযোগিতার বাজারে তারা এগিয়ে যেতে পারবে। স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগীরা যাঁরা এক দোকান নির্ভর পুরোনো প্যাটার্নে ব্যবসা করে চলেছেন তাঁদেরও নিজেদের পালটাতে হবে এবং নিজস্ব ব্র্যান্ড গ্রহণ করে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

জ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার উন্নয়ন

উদ্যোগ সংক্রান্ত, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সংক্রান্ত বেশিরভাগ গবেষণায় যে জিনিসটি উঠে এসেছে তা হল উদ্যোগ-উন্নয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞানের গুরুত্ব। বর্তমানের জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতির যুগে জ্ঞানভাণ্ডারের যথাযথ ব্যবহার দেশের উন্নয়নকে উঁচু স্তরে পৌঁছে দিতে পারে, লিঙ্গ-সাম্য এক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। কিন্তু ভাবতবর্ষে জ্ঞানের উন্মেষ এবং তার যথাযথ ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। এই ফারাক ক্রমশ কমিয়ে আনার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

দেশের আর্থিক বিকাশ ক্রমশ আরও জ্ঞান-নিবিড় হয়ে চলেছে। আনুমানিক হিসাব থেকে জানা যায় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ শিল্পোৎপাদন তথ্যর উপর নির্ভরশীল। এই সব তথ্যের আদান প্রদান চলেছে বিভিন্ন পর্যায়, যেমন পণ্যের গুণমান, উৎপাদন-ব্যয়, উৎপাদনের সময় প্রভৃতি এবং এগুলির উপর ভিত্তি করে উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা হচ্ছে।

পরিষেবা ক্ষেত্র—বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক বিকাশের প্রধান উৎস—মূলত জ্ঞান-ভিত্তিক। এই ধরনের প্রচেষ্টা সফল করতে তথ্য ও জ্ঞান, উভয়েরই সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

তথ্য-ব্যবস্থাপনা ডেটাবেস-ভিত্তিক। জ্ঞান-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত জ্ঞান অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করে নিজের উন্নতিসাধনে প্রয়োগ করতে পারলে গোটা ব্যবসাটিরই ভোল পালটানো যায়। সঠিকভাবে জ্ঞান-পরিচালন করতে পারলে তা অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে। তবে শুধুমাত্র এককালীন পদক্ষেপ হিসাবে এর সুফল মেলা ভার। দীর্ঘমেয়াদে সুফল লাভ করতে এবং এই ধারা বজায় রাখতে উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো ও পদ্ধতি দরকার।

একটি 'উন্নয়ন এজেন্ডা' এই চারটি জ্ঞান-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল :

১. **জ্ঞান সৃষ্টি ও অর্জন :** নির্দিষ্ট কোনও আবিষ্কার, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক তথা লোকাচার প্রভৃতির মাধ্যমে এটি ঘটে থাকে।

২. **জ্ঞান অভিযোজন :** এটি ঘটে থাকে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বা উপযুক্ত পরিবেশ উদ্ভাবন প্রয়োগের মাধ্যমে।

৩. **জ্ঞানের প্রসার :** বিভিন্ন প্রথাগত ও অপ্রথাগত মাধ্যমে জ্ঞান-স্রষ্টা ও আয়ত্তকারীদের থেকে জ্ঞান-ব্যবহারকারীদের কাছে জ্ঞান চালান করা হয়।

৪. **জ্ঞানের প্রয়োগ :** মাঠ, কারখানা, শ্রেণিকক্ষ, হাসপাতাল প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে এটি ঘটে থাকে।

ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। এমনকী এই দলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও অবস্থানগত পার্থক্য। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে অর্জিত জ্ঞান আহরণ করে দ্রুতগতিতে উন্নতির কাজে লাগানো বর্তমানে

একটি চ্যালেঞ্জ। প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে যেটি অপরিহার্য সেটি হল বিভিন্ন মন্ত্রকের গৃহীত প্রকল্পগুলির সার্বিক পর্যালোচনা করা। সত্য কথা বলতে কী, এই সব প্রকল্পগুলির বেশির ভাগই বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয়। কেবলমাত্র বেসরকারি ক্ষেত্রের পারদর্শিতাকে গ্রহণ করে সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারলে অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রের ভূমিকা

দেশের আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী হল একটি আধুনিক, সুসংগঠিত এবং সুপ্রসারিত পরিকাঠানো। অর্থমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে আনুমানিক ১ লক্ষ কোটি টাকার পরিকাঠামো প্রকল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঢিলেমি রয়েছে। প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে সময় গড়িয়ে যাওয়া এবং খরচ বেড়ে যাবার ফলে এই ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়নি। তাছাড়া উৎপাদনক্ষেত্রটি বিগত কয়েক বছর যাবৎ শ্লথগতিতে চলেছে। এই ক্ষেত্রটির জিডিপি ১৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে বৃদ্ধি করা এবং এর ফলে ১০ কোটি দক্ষতাভিত্তিক চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে বিগত কয়েক মাসে নতুন সরকার পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং উৎপাদনশিল্পের বিকাশ—এই দু'টি ক্ষেত্রকে তাদের মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

একথা ঠিক যে বিদেশ থেকে বিনিয়োগ এবং নতুন প্রযুক্তি দেশে নিয়ে আসার দিকটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একই সঙ্গে দেখতে হবে যাতে এর ফলে নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়, উদ্ভাবনের বিকাশ ঘটে এবং দেশে উৎপাদনক্ষেত্রটি প্রসার লাভ করে। তাছাড়া উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বিদেশি প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর উপযুক্ত গ্রহীতারও প্রয়োজন রয়েছে। এই সব গ্রহীতারা হল উৎপাদন-সংগঠক যারা প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাজারের উপযোগী জিনিসপত্র তৈরি করে এবং এই বাজার হতে পারে অভ্যন্তরীণ অথবা রপ্তানি বাজার। বিদেশি গবেষণাগারের অনুকরণে দেশে গবেষণাগার স্থাপন করলেই নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। দেশের গবেষণাগারগুলির উচিত শিল্পোদ্যোগগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে উদ্ভাবনী ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে এগিয়ে চলা। স্থানীয় অংশীদারদেরও শিল্প গঠনের মানসিকতা থাকা প্রয়োজন, কেবলমাত্র ব্যবসার মানসিকতা নয়; প্রয়োজন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিল্প গড়ে তোলার এক দীর্ঘস্থায়ী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। শুধুমাত্র সত্বর জিনিসপত্র বিক্রি করে লাভের কড়ি ঘরে তোলার মানসিকতা থাকলে চলবে না। সুতরাং অবাক হবার বিষয় নয় যে বেসরকারি কোম্পানিগুলিতেই প্রযুক্তি গ্রহণের কাজটি বেশি করে ঘটে থাকে, যাঁরা প্রমাণ করতে চান 'আমাদের দেশেও এই কাজ করা সম্ভব এবং আগামী দিনে আমরা এই কাজ আরও ভালোভাবে করব'।

চীনে দেশীয়-মালিকানাধীন কোম্পানি-গুলিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই তাদের উৎপাদন সংক্রান্ত নীতি রচিত হয়। চীনে বিদেশি কোম্পানিগুলির একটি অন্যতম ভীতি হল যে চীন তাদের মেধাসত্ত্ব চুরি করে নিতে পারে। চীনের রয়েছে এক বিশাল বাজার এবং এই বাজারের প্রলোভনেই বিদেশি কোম্পানিগুলি সেখানে ছুটে যায়। যদিও চীন সরকারের নীতিতে অতিথিপরায়ণতার লক্ষণ বিশেষ দেখা যায় না, বিশেষত মেধাসত্ত্বের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা বেশি করে প্রযোজ্য। চীনে মেধাসত্ত্ব আইন তৈরি করা হয়েছে তাদের নিজেদের কায়েমি স্বার্থকে মাথায় রেখেই, যদিও দেখানো হয় যেন বিদেশি কোম্পানির স্বার্থ সুরক্ষিত করতেই তারা এই আইন প্রণয়ন করেছে। চীন সরকারি সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে তাদের কেনাকাটার ব্যাপারটা সারে এবং এই প্রসঙ্গে তাদের আসল উদ্দেশ্য হল নিজেদের তৈরি প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটানো। তাছাড়া তারা এমন এক জাতীয় মানদণ্ড ব্যবহার করছে যা নিজেদের উদ্যোগগুলির সঙ্গে খাপ খায় এবং যার ফলে বিদেশি প্রতিযোগীদের চীনা সংস্থার সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে মেধাসত্ত্ব সম্পর্কে ভারতের অবস্থানটা হওয়া উচিত এর ঠিক উলটো—অর্থাৎ, বিশ্বে শক্তিশালী মেধাসত্ত্ব আইন গড়ে তোলার পক্ষে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে হবে। অবশ্য এই সব ব্যক্তির প্রস্তাব পুরোপুরি মেনে নেবারও প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে দেশ তার নিজের মতোই চলবে এবং নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তির কথা বিবেচনা করে যেটি ভালো সেটিই গ্রহণ করবে। দেখতে হবে মেধাসত্ত্ব আইনের ক্ষেত্রে যেন কোনও একাধিপত্য গড়ে না ওঠে।

বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তন এবং দেশের অর্থনীতিতে তার তুলনামূলক অবস্থান এগুলির প্রেক্ষিতে নীতি-নির্ধারকদের জাতীয় উৎপাদন নীতিটিকে দেশের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে শক্তপোক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। দেশের আর্থিক বৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ণ থাকার বিষয়টি এর ওপরই নির্ভরশীল। পরিকাঠামো এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতাগুলি অবশ্যই দূর করতে হবে। তাছাড়া দেশে পারদর্শিতার আবহ গড়ে তুলতে কঠোর নীতি প্রণয়ন করা জরুরি। মনে রাখতে হবে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ফিরে আসার দিন আর নেই। তাছাড়া চীনকে অনুকরণ করাও উচিত হবে না, আমাদের চ্যালেঞ্জ আমাদের মতো করেই মোকাবিলা করতে হবে। উৎপাদনশিল্পে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান উপায় হল দেশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো।

ভবিষ্যতের পথ চলা

দেশের অর্থনীতিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও উৎপাদনশিল্পের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে সরকারকে অনুঘটকের ভূমিকা নিতে হবে যাতে এই ক্ষেত্রগুলি বিকশিত হয়। দেশের অর্থনীতিকে বৃদ্ধির পুরোনো পথে ফিরিয়ে আনতে ২০১৫-র কেন্দ্রীয় বাজেটে বেশ কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। যেমন কর আইনের ৮০১এ ধারায় শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সময়সীমা ৩১ মার্চ ২০১৪ থেকে আরও ৫ বছর বাড়িয়ে দেওয়া এবং মিনিমাম অলটারনেট ট্যাক্সের (MAT) ক্ষেত্রে ছাড় ঘোষণা করা। এর ফলে পুনর্নবীকরণ ও চিরাচরিত শক্তির উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ জোগাবে।

অবশ্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (SEZ) যেসব উদ্যোগগুলি গড়ে উঠেছে তাদের ক্ষেত্রে এবং ডেভেলপারদের ক্ষেত্রে মিনিমাম অলটারেনট ট্যাক্সের রেহাইয়ের সুবিধেটা তুলে দেওয়া হয়েছে। আগের সুবিধাভোগীরা অবশ্য এ ব্যাপারটা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ সরকারের আশ্বাসের প্রেক্ষিতেই তারা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে। সুতরাং বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে সরকারের উচিত করের এই ছাড় পুনরায় চালু করা।

বেশ কিছু পরিকাঠামো প্রকল্প নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেই হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং এসব ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত তহবিল (স্পেশাল পারপাস ভেহিক্‌ল) গড়া হয়েছিল। এই তহবিলের উৎস হল ইক্যুইটি ও ঋণপত্র। সরকারের তরফে কর আইনের ১৪এ ধারা কার্যকর করার ফলে এই সব পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েছে। কারণ এই ধারায় ঋণপত্রের ওপর সুদ দেওয়ার ব্যবস্থাটিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে এই সব সংস্থা তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়বে এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও ব্যাহত হবে। সরকারের উচিত বিষয়টির সংশোধন করা।

দীর্ঘ দিনের দাবি হল বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলিকে পরিকাঠামোর মর্যাদা দেওয়া, কারণ এই ক্ষেত্রগুলি বহু দিন ধরেই উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। তাছাড়া আর্থিক সংস্থা ব্যাংক এদেরও দাবি, কর আইনের ১০(২৩জি) ধারাটিকে পুনরায় চালু করা। এর ফলে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ঋণের সুদের উপর তাদের কর ছাড়ের সুযোগ থাকবে এবং পরিকাঠামো কোম্পানিগুলিও কম সুদে লোন নিতে পারবে যার নিট ফল দাঁড়াবে পরিকাঠামো ক্ষেত্রটি চাঙ্গা হয়ে ওঠা।

চালু করা হয়েছে কর আইনের ৩২এ সি ধারা এবং এর ফলে নতুন মেশিনপত্র বসানোর বার্ষিক খরচের ১৫ শতাংশ কর ছাড় পাওয়া যাবে। ৩১ মার্চ ২০১৩-র পর থেকে ১ এপ্রিল ২০১৫-র আগে পর্যন্ত যেসব মেশিন বসানো হয়েছে কেবলমাত্র সেগুলির ক্ষেত্রেই এই ছাড়ের সুযোগ থাকবে, অন্য ক্ষেত্রে নয়। তবে পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে এই সুবিধা আরও তিন বছর বাড়ানো যেতে পারে এবং ছাড়ের পরিমাণ ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা যেতে পারে।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেও সরকারের মনোভাব পরিষ্কার করা উচিত যে তারা এই সব পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী। উদাহরণস্বরূপ, প্রকল্পগুলি লাভজনক হয়ে উঠতে পারে যদি প্রকল্পর ছাড়পত্রর সময় কর কিছুটা কমানো এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে কিছুটা ছাড় দেবার কথা ঘোষণা করা হয়, কারণ পরবর্তীকালে কর ছাড় এবং অন্যান্য সুবিধা আদায়ের জন্য দাবি জানিয়ে সেগুলি মঞ্জুর করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

সমস্ত পরিকাঠামো ক্ষেত্রের জন্য একই ধরনের সুবিধা চালু করার জন্য সরকারের কাছে দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে। যেমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিষেবা শুল্কের ছাড় রয়েছে—বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর, রেল প্রভৃতি। কিন্তু এই ছাড়ের আওতায় আনা হয়নি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ক্ষেত্র, যেমন জল, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি।

দেশীয় উৎপাদনশিল্পের ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের দিক হল কেন্দ্রীয় ভ্যাট ফেরত দেবার (Cenvat credit) ব্যবস্থা আরও নমনীয় করা। তাছাড়া দেখতে হবে উৎপাদন এবং পণ্য বিক্রি করার প্রতিটি পর্যায়ে কর বসিয়ে উদ্যোগগুলির উৎপাদন-ব্যয় যেন বাড়িয়ে তোলা না হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে রয়েছে দু'বার কর আদায় ব্যবস্থা, একবার পরিষেবা শুল্ক (সার্ভিস ট্যাক্স) হিসেবে এবং আর একবার ভ্যাট (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স) হিসেবে। ❑

[লেখক ইনস্টিটিউট অব স্মল এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর ডিরেক্টর।
email : director@isedonline.org]

উৎপাদনকেন্দ্রিক বিকাশ, প্রতিযোগিতা এবং চ্যালেঞ্জ

সর্বাত্মক অর্থনৈতিক বিকাশ ও সুস্থিত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উৎপাদনক্ষেত্রের সুষম বিকাশ। রপ্তানির বাজারে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকতে হলেও উৎপাদনক্ষেত্রের পরিকাঠামোগত উত্তরণ একান্ত আবশ্যক। এর সঙ্গে জড়িয়ে কর্মসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিও। উৎপাদনকেন্দ্রিক বিকাশের পন্থাপদ্ধতি, প্রতিবন্ধকতা ও তা অতিক্রমের উপায় এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন **অরূপ মিত্র।**

অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যে শিল্পায়ন, আজকের উন্নত দেশগুলির অভিজ্ঞতা সেই সাক্ষ্যই দেয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিকাশের লক্ষ্যে উৎপাদন, নয়ের দশক থেকে কতটা জটিল ও সামস্যাসংকুল হয়ে উঠেছে, জিরমাই ও ভার্সপ্যাগেন তাঁদের পর্যবেক্ষণে তা দেখিয়েছেন। উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষা ও আয়গত প্রভেদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রভাব নিয়েও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য উঠে এসেছে তাঁদের সমীক্ষায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমের শিল্পায়ন, বিকাশের মূল চালিকাশক্তি বলে ডেলাস ও কৌবি মন্তব্য করেছেন। শিল্পায়নের জন্য যন্ত্রপাতিতে লগ্নির বদলে তাঁরা জোর দিয়েছেন শ্রমশক্তি ও তার উপাদানের ওপর বিনিয়োগে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়নই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে তাঁরা মত প্রকাশ ক রেছেন।

বিশ্বায়ন, বিভিন্ন দেশকে বিকাশের রথে সওয়ার হতে বাধ্য করেছে। বাণিজ্য উন্মুক্তকরণ, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো, মূলধনের সচলতা, প্রযুক্তি হস্তান্তরের মতো বিকাশমুখী বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করেছে দেশগুলি। প্রযুক্তি হস্তান্তরের পক্ষে সাধারণত যে যুক্তি দেওয়া হয় তা হল, যে আবিষ্কার একবার হয়ে গেছে, তা পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা না চালিয়ে হস্তান্তর করলে দেশগুলির খরচ বাঁচবে। তবে নতুন প্রযুক্তির আমদানি মূলত মূলধন ও দক্ষ শ্রমনির্ভর হয়। তাতে দক্ষ শ্রমিকদের চাহিদা বাড়লেও অদক্ষ শ্রমিকদের কাজের সুযোগ কমে।

ভারতীয় শ্রম-আইন সম্পূর্ণ সেকেলে এবং অত্যধিকভাবে শ্রমিকদের পক্ষে হওয়ায় শ্রমিক নিয়োগ কম হয় বলে অনেকে মনে করেন। শ্রমের বাজার নমনীয় না হওয়ায় অর্থনৈতিক বিকাশ ও কর্মসংস্থানের ধারাবাহিক সুযোগ সৃষ্টি হয় না। অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রবক্তারা তাই শ্রমের বাজার বিনিয়ন্ত্রণের দাবিতে মুখর। বিশ্বায়ন এবং শিফ্‌টের মাধ্যমে উৎপাদন, মজুরি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াবে বলে তাঁদের ধারণা। বাণিজ্যক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্কারের সাফল্যের জন্যও শ্রমের বাজারের সংস্কারসাধন একান্ত আবশ্যক। গবেষকরা মনে করেন, কাজের ধরন, মজুরি, ছাঁটাই-এর মতো বিষয়গুলিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রমের বাজার অনমনীয়। এই অনমনীয়তার উৎস সংশ্লিষ্ট শ্রম আইনগুলি। এছাড়া জমি, পরিকাঠামো, দক্ষ শ্রমশক্তির মতো বিভিন্ন বিষয়ও বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে।

জোগানের দিক থেকে দেখলে আরেকটি বিষয় হল দক্ষ শ্রমিকের অভাব। মোট শ্রমশক্তির অধিকাংশই অদক্ষ হওয়ায় তাদের কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। দক্ষতার অভাবে বহু শ্রমিক, কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য হয়। নীতিগত দিক থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দক্ষতা বাড়াতে হবে, করতে হবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। ডিপ্লোমা দেয়, এমন কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে বেশ কম। তাই এক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি। এছাড়া কর্মরত শ্রমিকদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের সুবন্দোবস্তও করতে হবে।

আগামী দশকে ভারতকে তার জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বিভিন্ন ধরনের। এই কর্মসংস্থান সৃষ্টির চালিকাশক্তি হতে পারে উৎপাদনক্ষেত্র। এছাড়া সুস্থিত অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকেও উৎপাদনক্ষেত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় উৎপাদনক্ষেত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন শিল্প-নীতি ও উন্নয়ন দপ্তর এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে ব্যস্ত। সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভারতের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে জাতীয় উৎপাদন নীতি, একঝলক আশার সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বজনীন মন্দা ও কর্মহীনতার মোকাবিলায় ব্যবস্থা না নিলে ভারতের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবার আশঙ্কা। জাতীয় উৎপাদন নীতি আগামী এক দশকে ১০ কোটি কর্মসংস্থান এবং দেশের জিডিপি-র এক চতুর্থাংশ আয়-অর্জনের অঙ্গীকার করেছে। নতুন এই নীতি ভারতের উৎপাদনক্ষেত্রের খোলনলচে বদলে দিয়ে অর্থনীতিকে সার্বিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এই নীতিতে পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিসমূহ, শ্রম আইন ও করব্যবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। তবে এর সবথেকে নজরকাড়া সংস্থান হল, জাতীয় উৎপাদন বিনিয়োগ অঞ্চল—NIMZ স্থাপনের প্রস্তাব। বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের ব্যয়সংকোচগত সুবিধাভোগের জন্য এখানে পরিকাঠামোগত সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে উৎপাদন কেন্দ্রগুলির এক-একটি গুচ্ছ গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি NIMZ আয়তনে অন্তত ৫ হাজার হেক্টর হবে। দূষণমুক্ত, জ্বালানি সাশ্রয়কারী প্রযুক্তির সাহায্যে গড়ে তোলা হবে বিশ্বমানের পরিকাঠামো সমন্বিত শিল্প শহর। অকৃষি জমিতে নির্মিত এই শহরগুলির মালিকানা থাকবে সংশিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির হাতে, থাকবে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা। নিয়োগকারীরা যাতে শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের সুবিধা পান, সেজন্য শ্রমের বাজারে আনা হবে নমনীয়তা। তবে এই নমনীয়তা যাতে শ্রমিকস্বার্থের সঙ্গে আপস না করে, সেদিকেও নজর রাখা হবে।

জাতীয় উৎপাদন নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলিকে উৎসাহদান। জিডিপি-তে উৎপাদনক্ষেত্রের ভাগ, বর্তমানের ১৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে। তবে,

শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার নজিরবিহীন উচ্চতায় নিয়ে যাবার যে লক্ষ্য জাতীয় উৎপাদন নীতিতে নেওয়া হয়েছে, তা শেষপর্যন্ত সফল না-ও হতে পারে। এর কারণ হল, উৎপাদনক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের খুব সামান্য অংশই সংগঠিত ক্ষেত্রে রয়েছে।

তাই অসংগঠিত উৎপাদনক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং তার গুণগতমান বৃদ্ধিও বিশেষ প্রয়োজনীয়। কাজের মাত্রা, প্রযুক্তি, অর্থের জোগান, শ্রমিকদের দক্ষতার মানোন্নয়নের মতো বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলিতে এক ধরনের উদ্ভাবনী বিপ্লব ঘটানো দরকার। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, অলংকার, বস্ত্রবয়ন, চর্ম, জুতোর মতো শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশেরও বেশি কর্মসংস্থান করে। শ্রমনিবিড় এইসব শিল্পের ওপর জোর দিলে অদক্ষ শ্রমিকরা আরও বেশি করে কাজের সুযোগ পাবে।

পরিকাঠামোগত দুর্বলতা, জ্বালানির জোগানে বাধা, রপ্তানি হারের মন্দ গতি, শ্রমনিবিড় শিল্পক্ষেত্রের খারাপ ফল, উদ্ভাবনী শক্তির অভাব, যথাযথ প্রযুক্তির প্রয়োগ না করা, আমলাতান্ত্রিক অনমনীয়তার মতো বিভিন্ন কারণও এই ক্ষেত্রের বিকাশ ও কর্মসংস্থান ব্যাহত করছে। আসছে না বিদেশি বিনিয়োগ।

অর্থনৈতিক বিকাশে রপ্তানির ভূমিকা অসামান্য। বিদেশি মুদ্রা অর্জন এবং দেশীয় উৎপাদনের নতুন বাজার সৃষ্টি—রপ্তানির মধ্য দিয়ে এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। পরিষেবা রপ্তানি বাড়লে কিন্তু অদক্ষ শ্রমিকদের কাজের সুযোগ বাড়ে না। একমাত্র উৎপাদনক্ষেত্রের রপ্তানি বাড়লে তবেই তা সর্বাত্মক উন্নয়নের রাস্তা খুলে দেয়।

বিশেষ করে শ্রমনিবিড় পণ্যের রপ্তানি বাড়লে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে। কৃষিক্ষেত্রের অতিরিক্ত শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়ে আসা যায়। তবে পণ্যের চাহিদা না বাড়লে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ে না। উঁচু মজুরিতে আরও নিয়োগের জন্য উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। মূলধন ভিত্তির বিস্তার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ছাড়া উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব নয়। সাধারণত ভাবা হয়, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটলে শ্রমিকদের কাজের সুযোগ কমবে। কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, উদ্ভাবন কখনওই সার্বিকভাবে কর্মসংস্থান কমায় না। কোনও নির্দিষ্ট স্তরে কাজের সুযোগ কমলেও অন্য স্তরে তা ফের বেড়ে যায়। এছাড়া নতুন প্রযুক্তির সুযোগ নিতে বহু নতুন সংস্থান এগিয়ে আসে। এতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে যায়।

এমন বেশ কিছু দামি পণ্য আছে, যেগুলির উৎপাদন প্রক্রিয়া শ্রমনিবিড়। ব্যয়বহুল হওয়ায় সেগুলির উৎপাদন কম মাত্রায় হয়। অথচ উন্নত দেশগুলির বাজারে তার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সিল্কের তৈরি জামাকাপড় এমন পণ্যের নিদর্শন। এগুলির উৎপাদন বাড়ানো গেলে বিদেশি মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থান—দুই-ই বাড়বে।

২০১৩-১৪ সালে ভারতের রপ্তানির ৬৩.৭ শতাংশ ছিল উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী, ২০.১ শতাংশ পেট্রোলিয়াম, ১৩.৮ শতাংশ কৃষিজ পণ্য এবং ১.৮ শতাংশ খনিজ দ্রব্য। (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩-১৪)। ভারতে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি কিন্তু বিশ্ববাণিজ্যের নিরিখে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে তা অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে। যেমন, ভারতের বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানি, বাংলাদেশের কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এমনকী যে সূতির বস্ত্রসামগ্রী ভারতের রপ্তানির একটা বড় অংশ অধিকার করে থাকে এবং যেখানে ভারতের তুলনামূলক সুবিধা আছে বলে মনে করা হয়—তাও আজ চীন ও বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখে। টেবিলের ঢাকা, তোয়ালের মতো কয়েকটি মাত্র সামগ্রীতে এখনও ভারতের আধিপত্য বজায় রয়েছে।

ভারতের শুল্ক কাঠামোও অত্যন্ত জটিল। নয়ের দশকের গোড়ায় ১২৮ শতাংশ থেকে ২০০৪-০৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে শুল্কের হার নেমেছে ২২.৪ শতাংশে। তবে গড় হার কমলেও এখনও বহু ক্ষেত্রে শুল্কের হার অত্যন্ত বেশি। কফি, চা, মদ, সুগন্ধী, চিনিজাত দ্রব্য, আঙুর, ফলের রস, গাড়ি, মোটরবাইকের মতো পণ্যে শুল্কের হার ১০০ শতাংশ বা তার বেশি। ভোজ্য তেল, গম, চাল ও কয়েকটি কৃষিপণ্যের শুল্কহার ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ। তবে আমদানি শুল্কের হার বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে অনেকটাই কমেছে। ২০১০ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্র, অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, স্বয়ংক্রিয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র, টেলিকম সম্পর্কিত যন্ত্রাদি, বৈদ্যুতিক ও পরিবহণ সামগ্রীর সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশের কাছাকাছি। ভারতীয় রপ্তানিকারকদের নানা বাধা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। লেটার অফ ক্রেডিট, আগাম পেমেন্টের প্রমাণ, আবেদনপত্রের প্রিন্ট আউট, ফরেন ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স সার্টিফিকেটের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ কাগজপত্র নিয়ে তাঁদের বারবার ছুটতে হয় সরকারি দপ্তরে। রপ্তানি-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ এক বড় প্রতিবন্ধকতা।

দেশে উৎপাদিত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশের বাজারে কম দামে বিক্রি করা অর্থাৎ এক কথায় যাকে ডাম্পিং বলে, তার প্রতিরোধে নেওয়া ব্যবস্থার জেরেও ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১০ সালের জুন পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে যে ৯০টি ডাম্পিং-প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ২২টি রাসায়নিক, ১৯টি প্লাস্টিক, ১১টি বস্ত্রবয়ন এবং ২৬টি ধাতব পণ্যের (প্রধানত লৌহ-ইস্পাত) সঙ্গে জড়িত। এই সবকটি ক্ষেত্রেই ভারত তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করে থাকে।

২০০৯ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে পঞ্চবার্ষিকী বিদেশ বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের অংশ দ্বিগুণ করার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে এই নীতিতে বস্ত্রবয়ন, চর্ম, হস্তশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতকে রপ্তানির নতুন বাজার খোঁজায় প্রয়াসী হতে হবে। সেই ২০০৭-০৮ সাল থেকে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের অভিমুখ একই থেকে গেছে।

লেনদেনের খরচ ও সময় কমাবার পন্থাপদ্ধতি নিরূপণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে এ সংক্রান্ত একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্ক ফোর্স লেনদেন ব্যয় কমানোর জন্য ৪৪টি বিষয় চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে ২১টির নিষ্পত্তি হয়েছে।

সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে, বিশেষত রপ্তানিনির্ভর ক্ষেত্রগুলিতে, মোট উপাদানের উৎপাদনশীলতার হার (Total Factor Productivity Growth—TFPG) অনেকটা বাড়াতে হবে। এছাড়া ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতার সামর্থ্য বাড়ানো সম্ভব নয়। TFPG বাড়াতে হলে পরিকাঠামো উন্নয়ন (বাস্তব, আর্থিক ও সামাজিক) এবং মুক্ত বাণিজ্য প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় এলে সেগুলির উৎপাদনশীলতা বাড়বে। সংযুক্তিকরণ ও উৎপাদন কেন্দ্রগুচ্ছের মাধ্যমে বাড়বে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা। পুরনো উৎপাদন কেন্দ্রগুচ্ছ স্তিমিত হয়ে এলে নতুন গুচ্ছ গড়ে তুলতে হবে। ভারতীয় উৎপাদন ও রপ্তানিক্ষেত্রের সামনে চ্যালেঞ্জ বিস্তর। সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্যে এগোতে হলে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে। উৎপাদনক্ষেত্রের বিকাশ এবং উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানির মধ্যে লুকিয়ে আছে সমাধানের চাবিকাঠি। ❑

[লেখক দিল্লীর 'ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিক গ্রোথ'-এর অধ্যাপক।
email : arup@iegindia.org]

ভারতীয় উৎপাদনশিল্পকে পরিবেশবান্ধব করে তুলতে প্রয়োজন উদ্ভাবন

গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ তথা জলবায়ু পরিবর্তন এখন গোটা বিশ্বের কাছেই মাথাব্যথার কারণ। আর উৎপাদনশিল্পই এই ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির প্রধান উৎস। পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলি তো বটে এমনকী ভারত ও চীনের মতো উদীয়মান অর্থনীতিগুলিও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের নিরিখে প্রথম সারিতে উঠে এসেছে। তাই এই সবুজ গ্রহকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাসযোগ্য করে রাখার স্বার্থে উৎপাদনশিল্পে এখন প্রয়োজন এমন সমস্ত উদ্ভাবন যাতে পরিবেশের যথাসম্ভব কম ক্ষয়ক্ষতি করে দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের পথে এগোনো যায়। 'অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রযুক্তি, 'ফ্রুগাল ইনোভেশন' বা 'শুরু থেকে আবার শুরু করা'র ধারণার মধ্যে যে রয়েছে সেই জীয়নকাঠি? বিশ্লেষণ করেছেন **বালকৃষ্ণ সি রাও।**

জলবায়ু পরিবর্তন—বিশ্বজুড়ে মানব-সমাজের কাছে এখন সবচেয়ে বড় বিপদ। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ) মিলেনিয়াম ইকোসিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট (এমইএ) এবং ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর মতো স্বশাসিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও এক বাক্যে এই রায় দিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে বিশ্বজুড়ে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে নানান গ্রিনহাউস গ্যাস (জিএইচজি) মিশেছে তার ফলেই আজ এই অবস্থা। বিপুল জনঘনত্ব, দীর্ঘ তটরেখা এবং নাগরিকদের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয়ের জন্যই জলবায়ু পরিবর্তন, প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সংকট ও আনুষঙ্গিক প্রভাবগুলির তীব্র ফলভোগ করতে হবে ভারতকে। শিল্প বিপ্লবের জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠছে উৎপাদনশিল্প এবং তা বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। সাম্প্রতিকভাবে ভারত ও চীনের মতো উদীয়মান অর্থনীতিগুলির কাছেও উৎপাদনশিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিশ্বায়নের যুগে এই উদীয়মান অর্থনীতিগুলিতে বহুবিধ উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড চলছে। শুধু তাই নয়, উন্নত দুনিয়ার বিভিন্ন সংস্থার সহযোগী সংস্থাগুলি এই দেশগুলিতে তাদের উৎপাদনের কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। উৎপাদনমূলক কাজকর্মের এহেন আউটসোর্সিং-এর ফলে ভারত বা চীনের মতো উদীয়মান বাজারে চালু উৎপাদন শিল্পের ভিত্তি নিঃসন্দেহে আরও মজবুত হয়েছে।

ভারতের উৎপাদনক্ষেত্র এখন অনেক পরিণত। ২০১২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের মোট উৎপাদনে ভারতের অবদান ১ শতাংশের কিছুটা বেশি[১] এবং ২০১৪ সালে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-তে উৎপাদনক্ষেত্রের অবদান ছিল ১৫ শতাংশ[২]। অদূর ভবিষ্যতে দেশের জিডিপি-তে উৎপাদনক্ষেত্রের অবদান আরও বাড়বে এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে। এই কথাটা মাথায় রেখে উৎপাদনক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরও পরিবেশবান্ধব করে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে—যাতে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি যতটা সম্ভব এড়ানো যায়। কারণ এটা ভুললে চলবে না যে গ্রিনহাউস নিঃসরণকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত ও চীন এখন প্রথম সারিতে। অদূর ভবিষ্যতেও যদি এই পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ চলতে থাকে তাহলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি কমাতে সরকারি হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। এছাড়াও বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যের প্রসারের জন্য পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের তকমাটাও এখন খুব জরুরি। কারণ বিশ্বজুড়ে সেই সব সামগ্রীরই চাহিদা বাড়ছে যেগুলির উৎপাদন, ব্যবহার এমনকী, ব্যবহারে শেষে ফেলে দেওয়ার পরও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় এগিয়ে যেতে গেলে প্রথম থেকেই পরিবেশবান্ধব দীর্ঘস্থায়ী প্রযুক্তি ও পরিষেবা গ্রহণ করতে হবে।

দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'

'দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন'-এর মূল কথাই হল পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি না করে সামগ্রিক বিকাশের পথে এগিয়ে চলা। জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংকটের ঠেলায় বিশ্বের অর্থনীতিগুলি এই 'দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন'-এর পথেই চলতে বাধ্য হচ্ছে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অন্তত পক্ষে এই গ্রহকে বাসযোগ্য করে রাখা যায়। 'শুরু থেকে শেষ' নয়, বরং 'দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন' বা 'সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট'-এর মধ্যে রয়েছে 'শুরু থেকে আবার শুরু করা'র এক

অভিনব ধারণা। এই ধারণা অনুযায়ী পরিত্যক্ত সামগ্রী বা যন্ত্রাংশের পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হয় যাতে একদিকে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি কমে, অন্যদিকে উন্নতমানের পণ্য ও পরিষেবার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। একথা বলা দরকার যে আগে 'শুরু থেকে শেষ'-এর ধারণা সর্বত্রই প্রচলিত ছিল যখন ব্যবহারযোগ্যতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পণ্যসামগ্রীগুলিকে ফেলে দেওয়া হত। 'দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন' এই ধারণা ভারতীয় উৎপাদন শিল্পের সামনে সর্বাত্মক বিকাশের পথ খুলে দিতে পারে। ভারতীয় উৎপাদনক্ষেত্র যদি পরিবেশবান্ধব পথে দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের পথে চলার নীতি গ্রহণ করে তবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বা 'ভারতে উৎপাদন করো'র আহ্বান সার্থক হবে। কারণ প্রধানমন্ত্রী ভারতের উৎপাদন পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে একে প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপযোগী করে তুলতে চেয়েছেন। প্রতিযোগী দেশগুলির মধ্যে অবশ্যই আছে চীন। শিল্পোৎপাদনে দ্রুত প্রথম সারিতে উঠে আসছে এই দেশ। রয়েছে জার্মানি। ইতিমধ্যেই শিল্পোন্নত এই দেশটি উৎপাদনক্ষেত্র সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব কমানোর জন্য পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ঘটিয়ে গ্রহণ করেছে। শক্তিসম্পদ কাজে লাগানোর বিশেষ পরিকল্পনা 'Energiewende'। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই সবুজ গ্রহের ওপর যে সংকট ঘনিয়ে আসছে তা মোকাবিলার জন্য আগেভাগেই বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ, এই দেশগুলিকে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি না করে, উৎপাদনশীলতার উন্নত হার বজায় রেখেও বিভিন্ন উৎপাদন শিল্পসামগ্রীও প্রক্রিয়া সৃষ্টির দৌড়ে এগিয়ে দিয়েছে। ফলে এই ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হবে তাতে আখেরে উৎপাদনশিল্প সামগ্রিকভাবে আরও দক্ষ ও কর্মকুশল হবে। তার ফলে উৎপাদনক্ষেত্রের কাজকর্ম পরিচালনা ব্যয় কমবে এবং এই ব্যয় কমা মানে লাভ বৃদ্ধি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদের কথা যদি বাদও দেওয়া যায় তাহলেও ভারতের মতো বিকাশশীল অর্থনীতির পক্ষে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রযুক্তির সুফল তুলনাহীন। ভারতের উৎপাদনক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বিভিন্ন অভিনব প্রক্রিয়া ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে সহায়ক হতে পারে। এগুলি হতে পারে নিতান্ত সাদামাটা বা অত্যাধুনিক। এগুলির ব্যবহার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা এমনকী মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। ভারতের যন্ত্রাংশ শিল্পকে পরিবেশবান্ধব হয়ে ওঠার শর্ত মেনে যন্ত্রসামগ্রী নকশা তৈরি ও তা উৎপাদনের এই সুযোগ হারালে চলবে না। এই শর্ত পালন হলেই ভারতের উৎপাদনশিল্পের পরিকাঠামো মজবুত হয়ে উঠবে। দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের মূল কথাই হল পরিবেশের যথাসম্ভব কম ক্ষয়ক্ষতি করে পণ্যের যথাযথ গুণমান বজায় রাখতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বশেষ জ্ঞান ও উদ্ভাবনের সাহায্য নেওয়া তথা গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ করে দেওয়া। এর ফলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বে এক অগ্রণী দেশ হয়ে ওঠার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদনের ধারণা বিভিন্ন ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে। শুধু তাই নয়, এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে যে বিপুল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে অন্য দেশগুলিও তার সাহায্য নিতে এগিয়ে আসবে। সবচেয়ে বড় কথা ভারতীয় উৎপাদনক্ষেত্রের এহেন আধুনিকীকরণ ঘটলে সামরিক ও অসামরিক দুই ধরনের সরঞ্জাম নির্মাণের ক্ষেত্রেই ভারতে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। এছাড়াও উৎপাদনক্ষেত্রে উদ্ভাবনের যে প্রভূত সুযোগ রয়েছে তা পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কোনও পণ্যের নির্মাণ প্রক্রিয়া চলাকালীন নকশায় যদি কোনও ত্রুটি লক্ষ করা যায় তাহলে এই ধরনের উদ্ভাবনের সুযোগ হাতে আসতে পারে। তখন সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামটির নকশায় পরিবর্তন আনলে সেটা এক সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভাবনা হয়ে উঠতে পারে। নয়তো নিদেনপক্ষে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটির গুণমান আরও উন্নত হতে পারে। এইভাবেই সংশ্লিষ্ট ত্রুটিগুলি দূর করা যেতে পারে। আবার, এই ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি নির্মাণ প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ তথা নির্মাণের সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতির পথ প্রশস্ত করতে পারে। আদতে উৎপাদনক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেই এই ধরনের উদ্ভাবনা বেশি প্রভাব পড়ে। উৎপাদনমূলক কাজকর্ম আউটসোর্সিং-এর ফলে এই ধরনের উদ্ভাবনার সুযোগ যে হাতছাড়া হয়ে যায় তা উপলব্ধি করে বর্তমান মার্কিন প্রশাসন দেশের সীমানার মধ্যেই উৎপাদনসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সীমিত রাখার ব্যাপারে কিছুটা উৎসাহ দিতে সাম্প্রতিককালে গঠন করেছে ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ফর ম্যানুফ্যাকচারিং ইনোভেশন (এনএনএমআই)। ভারতের ক্ষেত্রে সহায়সম্পদের অভাবের মধ্যেও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় রাখতে হবে। যেক্ষেত্রে সম্ভব সেক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়ে ব্যয়সাশ্রয়ী ছিমছাম সরঞ্জাম বা পোশাকিভাষায় 'ফ্রুগাল ইনোভেশন'-এর পথে এগোনো উচিত। ভারতে এই ধরনের পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কেননা এগুলির গুণমান যেমন উন্নত তেমন সমাজের বৃহত্তর অংশের কাজে সুলভ ও সহজলভ্যও বটে। ফলে এই ধরনের পণ্যসামগ্রী জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় এই 'ফ্রুগাল ইনোভেশন' বা অনাবশ্যক অংশ কাটছাঁট করে পণ্যসামগ্রী তৈরির ধারা যে আজ আর তৃণমূলস্তরে আবদ্ধ নেই তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের উদ্ভাবনা আদতে পরিবেশবান্ধব দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের পথই প্রশস্ত করে। বিশ্বের প্রধান গতিশীল অর্থনীতিগুলিতে যে সমস্ত পণ্য ও পরিষেবা উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই যদি 'ফ্রুগাল ইনোভেশন'-এর এই শর্ত যদি মেনে চলা যায় তাহলে বিকাশের পথ দীর্ঘস্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব হতে বাধ্য।

প্রয়োজন গবেষণা ও উন্নয়ন

ভারতের উৎপাদনক্ষেত্রকে পরিবেশবান্ধব দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের পথে নিয়ে যেতে গেলে দেশীয় প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নে আরও বেশি করে মনোযোগ দিতে হবে।

এই ধরনের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের ফলে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা তো মিটবেই সেইসঙ্গে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের নিরিখে চীন ও অন্যান্য উন্নত দেশের সমকক্ষ হতে উঠতে পারবে ভারতের উৎপাদনক্ষেত্র। ভারতের উৎপাদনক্ষেত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে উপযুক্ত উৎকর্ষকেন্দ্র রয়েছে এদেশে। এই ধরনের গবেষণাকেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (আইআইএসসি) সহ অন্যান্য অগ্রণী শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত বা অসামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাতীয় গবেষণাগারগুলি একাজের সবচেয়ে বড় শক্তি ও সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রের বহুসংস্থাই এখন বিশ্বমানের। এই ধরনের সংস্থাগুলির সঙ্গে জাতীয় গবেষণাগার ও শিক্ষাবিদের মেলবন্ধনও সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যপূরণের সহায়ক হতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

উৎপাদনশিল্পের চিরাচরিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও স্থায়িত্বের বিচারে ভারতের শিক্ষাবিদ ও গবেষক মহল সর্বাধুনিক 'ডিসরাপটিভ প্রযুক্তি'র ওপরও মনোনিবেশ করতে পারে। 'ডিসরাপটিভ প্রযুক্তি' অর্থাৎ অত্যাধুনিক যে প্রযুক্তি আসার ফলে প্রচলিত প্রযুক্তিগুলি অচল হয়ে পড়ে। যেমন কম্পিউটার আসার পরে টাইপরাইটারের ক্ষেত্রে হয়েছিল। যেমন সাম্প্রতিক দশকে থ্রিডি প্রিন্টিং বা অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রযুক্তির আসার ফলে মূলত অধাতব সামগ্রী দিয়ে তৈরি সরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রায় বিপ্লব এসেছে। তবে ধাতুর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবা বা মহাকাশ গবেষণার মতো যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ধাতব সামগ্রী ব্যবহার করা হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রযুক্তি এখনও সেই আদ্যিকালেই পড়ে রয়েছে। তবে গবেষণার মাধ্যমে চিরাচরিত পদ্ধতি বা 'সাবট্র্যাকটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং' পদ্ধতির মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতেই এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। চিরাচরিত পদ্ধতিতে না হেঁটে প্রক্রিয়াকরণের সময় বা 'সাইকেল টাইম' কমিয়ে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রযুক্তির মধ্যে। মহাকাশ গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে থ্রিডি প্রিন্টেড অংশ তৈরির ক্ষেত্রে বর্তমানে এই প্রযুক্তিরই সুবিধা নেওয়া হচ্ছে। তাই ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশবান্ধব তথা কম কাঁচামাল ব্যবহার করে যথাসম্ভব অনাবশ্যক অংশ কাটছাঁট করে ছিমছাম ও সুলভ পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জোড়া লক্ষ্যপূরণের জন্য 'অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং' বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নে আরও বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে। এরই সঙ্গে পণ্যসামগ্রী থেকে অনাবশ্যক অংশ বাদ দেওয়া, স্থায়িত্ব এবং 'ডিসরাপটিভ প্রযুক্তি'র ধারণার মিশেল ঘটানো যায় তবে তা হবে অভিনব। এইভাবে উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তিকে তখন অন্যান্য দেশেও রপ্তানি করা যাবে। এছাড়াও, অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে কোনও যন্ত্রাংশ বদল না করেও কোনও সামগ্রী বা সরঞ্জামের মেরামতি সম্ভব। সহজে মেরামতির এই কৌশল পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের 'শুরু থেকে আবার শুরু'-র ধারণার সঙ্গে একদম মানানসই। এছাড়াও অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রযুক্তির সাহায্যে উন্নত গুণমানসম্পন্ন বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক সহজ হবে। এর পরে হয়তো নতুন নতুন ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলিকে কাজে লাগানোর পথও খুলে যাবে।

এছাড়া রোবটের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিগ ডেটা ও 'ক্লাউড কম্পিউটিং'-এর মতো ক্ষেত্রগুলিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত বিষয়ই কিন্তু ভারতের উৎপাদনক্ষেত্রের আধুনিকীকরণের পথ প্রশস্ত করার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে।❑

[লেখক চেন্নাইয়ের IIT-তে অধ্যাপনা করেন।
email : balkrish@iitm.ac.in]

সূত্র :
১. ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড ইক্যুইটি ফাউন্ডেশন (আইবিইএফ) 'বুস্টিং ইন্ডিয়াজ ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপোর্ট'।
২. দ্য ইকোনমিস্ট, 'রিভাইডিং ইন্ডিয়াজ ইকোনমি' ২৪ মে, ২০১৪।

শ্রম-আইন ও ভারতের উৎপাদনক্ষেত্র

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

শ্রম-আইনের উত্তরোত্তর সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এই সব সংস্কারের প্রতি রাজনৈতিক বিরোধিতা কমবে আর সংস্কারের পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থনও বাড়বে। একটি সংস্থার মধ্যে বহু সংখ্যক ইউনিয়ন না রাখাই শ্রেয় কেননা তার ফলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দেয় আর উৎপাদনশীলতা বিরাটভাবে কমে যায়। বিশ্লেষণ করছেন **দেবাশিস মিত্র।**

ভূমিকা

পর্যাপ্ত শ্রমিকের দেশ ভারতবর্ষে ছোট, 'অসংগঠিত' অথবা অ-নথিভুক্ত উৎপাদন শিল্পসংস্থাতেই মূলত শ্রম-নিবিড় উৎপাদনপদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যে সব পদ্ধতি আদৌ প্রযুক্তিগত বিকাশের সীমান্তেও থাকে না। অন্যদিকে 'প্রথাগত' উৎপাদন-শিল্পের সিংহভাগ উৎপাদন ব্যবস্থাই হল মূলধন-নিবিড়। তাই এদেশে প্রচুর শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও এবং এর বিরাট জনসংখ্যা ও বৃহদাকার অর্থনীতি হলেও শ্রম-নিবিড় উৎপাদনগত ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে ভারতের ভাগটা নিতান্তই সামান্য। কোনও কোনও ভাষ্যকার এই হাতাশাজনক ফলাফলের জন্য সুনির্দিষ্ট শ্রম-আইনের কঠোরতাকে দায়ী করলেও অন্যরা অবশ্য এই যুক্তিও দেখান যে ভারতীয় বাণিজ্যপতিরা ওই সব আইনকে পাশ কাটিয়ে চলার রাস্তাও খুঁজে নিয়েছেন।

এই নিবন্ধে আমি ভারতের উৎপাদন-ক্ষেত্রকে বাধাদানকারী ওই সব শ্রম-আইনের (যদি আদৌ থাকে) ভূমিকা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি শ্রম সংস্কারের সম্ভাব্য চাহিদা ও কিছু কিছু নীতিগত সংশোধনের সুপারিশগুলিও খতিয়ে দেখব।

ভারতের শ্রম-আইন

ভারতের শ্রম-বাজারে যে অনড় মনোভাব দেখা যায় সেটা প্রধানত সেকেলে শ্রম আইনগুলোর জন্যই কেননা ওগুলো অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত—না ওরা চাহিদা অনুসারে সংস্থাগুলিকে শ্রমের অদলবদল ঘটাতে দেয় আর অন্যদিকে প্রযুক্তিগত ধাক্কাটা সামলানো খুব শক্ত। ৫২টি কেন্দ্রীয় আইনসহ এদেশের প্রায় দুশোটি শ্রম-আইন আছে যেগুলোর মধ্যে সবথেকে বেশি নিয়ন্ত্রণমূলক (অবশ্যই একটিমাত্র নয়,) হল, শিল্প বিরোধ আইন (আইডিএ)। এই আইনের সংস্থান অনুযায়ী ১০০-র বেশি শ্রমিক নিয়োগকারী সংস্থাকে শ্রমিক ছাঁটাই করতে হলে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে। ওই অনুমতিটা পাওয়া যায় না বললেই চলে। এর সঙ্গেই রয়েছে শিল্প নিযুক্তি (স্থায়ী আদেশ) আইন যার দরুন কাজের ধরনের সংশোধন কিংবা একই সংস্থারই অন্য কারখানায় বদলি (কোনও কোনও রাজ্যে একশোর বেশি শ্রমিক বিশিষ্ট সংস্থায় আয় কোথাও কোথাও ৫০-এর বেশি শ্রমিক সহ সংস্থায়) অত্যন্ত কঠিন আর প্রায় অসম্ভব।

আবার ট্রেড ইউনিয়ন আইনটি বহু শ্রমিক সংগঠনের সৃষ্টির পথ সুগম করে দিল কোনও সংস্থায় মাত্র সাতজন শ্রমিক মিলেই সংগঠন গড়ার সুযোগ করে দিয়ে। যে কেউই বুঝতে পারবেন ইউনিয়নের বহুত্ব নিয়োগকর্তাদের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন আইনটি ইউনিয়নগুলোকে ধর্মঘট করার অধিকারও দিয়েছে আর সেই সঙ্গে দিয়েছে নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে আইনি বিবাদে শ্রমিকের পক্ষে লড়ার অধিকার। তবে যেহেতু কমপক্ষে সাতজন শ্রমিক দরকার কোনও সংগঠন গড়ে তুলতে, তাই যে সংস্থায় সাতজনের কম শ্রমিক রয়েছে সেখানে এরকম ইউনিয়নের প্রশ্ন ওঠে না। তাই এটা এক হিসেবে সংস্থাকে খুব ছোট আকারে সীমিত থাকতে বাধ্য করা বিশেষ করে শ্রম-নিবিড় শিল্পের ক্ষেত্রে।

অন্য আরও শ্রম-আইন আছে যেমন কর্মচারী রাজ্যবিমা আইন, কারখানা আইন, কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল ও অন্যান্য সংস্থান আইন, ন্যূনতম মজুরি আইন, মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন প্রভৃতি যেগুলো কিনা সীমানায় থাকা নানান কর্মসংস্থান স্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর একটা ব্যাপক ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। এই সব শ্রম-আইন কাজের ন্যূনতম শর্তাদি ও সুবিধা ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেয়।

শেষে রয়েছে ঠিকা শ্রমিক আইন যেটা ঠিকাচুক্তিতে গৃহীত শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণ ও সীমিত করে আর তার মাধ্যমে স্থায়ী ও ঠিকাচুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের প্রতিস্থাপনীয়তা সীমায়িত করে আর একটা জরুরি অবলম্বন যার মাধ্যমে ব্যবসায়িক সংস্থা তার খরচ কমাতে পারে। তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্তত কাগজে-কলমেও। নির্দিষ্ট কিছু কাজের ক্ষেত্রে আবার ঠিকাচুক্তির শ্রমিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

শিল্প সম্পর্কের বিষয়টা যেহেতু ভারতীয় সংবিধানের যুগ্ম তালিকাভুক্ত, রাজ্য সরকারগুলো তাই শিল্পবিরোধ আইনে নিজেদের ইচ্ছামতো সংশোধনী আনতে পেরেছে, তা সেটা (যুক্তরাষ্ট্রীয়) কেন্দ্রীয় আইন হলেও। তাই রাজ্যভেদে শ্রম-বাজারের সীমাবদ্ধতাও যথেষ্টই আলাদা।

সাম্প্রতিক শ্রম সংস্কারমুখী প্রয়াস

স্বাধীনতা উত্তরকালের প্রায় গোটা সময়টা ধরেই শ্রম-আইনে রাজ্যগুলো সংশোধনী এনেছে যাতে করে ওই সব রাজ্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় বিধির তুলনায় আইনগুলো হয়

মালিকদের দিকে আর নয় শ্রমিকদের দিকে ঝুঁকে থাকতে পারে আর ওই ঝোঁকটা ঠিক কোনদিকে হবে সেটা নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের ঝোঁকের ওপরে। তবে শ্রম-আইনের সাম্প্রতিক সব পরিবর্তনের ধারাটা আগের মতো নয়। এখন মূলত বিদেশি মূলধন টেনে আনা, পরিকাঠামো উন্নয়ন আর অনেক বেশি উদার ব্যবসায়িক অবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যেই এই সব পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

রাজস্থান সরকারের সাম্প্রতিক সংশোধনীতে শিল্পবিরোধ আইনের আওতায় শ্রমিক ছাঁটাই-এর অনুমতি নেওয়ার জন্য শ্রমিক সংখ্যার সীমাটা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ করা হয়েছে। এতে ফ্যাক্টরি আইনের আওতায় কোনও সংস্থার নথিবদ্ধ হওয়ার জন্য ন্যূনতম কর্মসংস্থানের সীমাটাও বাড়ানো হয়েছে। ফ্যাক্টরি আইন, আগেই বলা হয়েছে, হল সেই আইন যার বলে শ্রমিকদের কাজের সময়, শ্রমদিবস, ন্যূনতম বয়সসীমা প্রভৃতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এর অতিরিক্ত হিসাবে রাজস্থানে প্রতিনিধিত্বমূলক ইউনিয়নের পঞ্জীকরণের জন্য ন্যূনতম সদস্যসংখ্যা সংস্থার কর্মীদের ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তন বহুসংখ্যক ইউনিয়নের মধ্যে মতের মিল ঘটানো আর দ্বন্দ্ব মেটানের দরুন উৎপাদনমুখী ব্যবস্থাপনাগত ও শ্রম সময় নষ্ট হওয়াটা কমাতে পারে। এছাড়া রাজ্য সরকারের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ (শিক্ষানবিশি) আইনের পরিবর্তন কর্মমুখী দক্ষতার বিকাশে প্রেরণা জোগাবে। অর্থনীতিবিদরা যাকে বলেন 'মানব মূলধন গড়া'।

কেন্দ্রে শ্রম সংস্কারের দিকে খুব সামান্যই কাজ হয়েছে, আর এ ধরনের সংস্কার আনার কাজটা প্রধানত রাজ্যগুলোর ওপরই চাপিয়ে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে যে কয়েকটামাত্র জরুরি পদক্ষেপ কেন্দ্রের তরফে নেওয়া হয়েছে তা হল সম্প্রতি একটি একত্রিত ওয়েব পোর্টাল খুলে দেওয়া যেখানে যেকোনও সংস্থা ১৬টি কেন্দ্রীয় শ্রম-আইন মেনে চলার ব্যাপারে প্রতিবেদন নিজেরাই জমা দিতে পারবে। এ ধরনের ওয়েব পোর্টালে একটি অ্যালগোরিদম সংযুক্ত থাকা উচিত বলে আশা করাই যায় যার সাহায্যে পরিদর্শকদের কোনও কোনও সংস্থায় যাওয়া উচিত তা আপনা থেকেই স্থির হয়ে যাবে। এটা তাই ইনসপেক্টর রাজ-এর থেকে সরে আসার সূচনা যার অর্থ ইনসপেক্টরদের মর্জি আর নিজস্ব খেয়াল কমা, হয়রানি আর সুবিধা খোঁজার মতো ব্যাপারগুলোও যথেষ্ট কমে যাওয়া। তাছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর বহনযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সংস্কারগুলির ফলে শ্রমিকদের বিচরণক্ষমতা বাড়ার প্রবণতা দেখা দেবে কেননা প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর বহনযোগ্যতা কর্মীদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টটি চাকরি বদলানোর সময়ে স্থানান্তর করানোর সুবিধা দেয়। এর অতিরিক্ত হিসাবে, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ আইনে বর্তমান সরকারের আনা সংশোধনে কর্মমুখী দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি উৎসাহ বাড়বে। অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে যেমন বলা হয়েছে, কর্মমুখী দক্ষতা বাড়াতে এখন নতুন এক 'কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রক' খোলা হয়েছে।

এই মন্ত্রক খুব শীঘ্রই কর্মমুখী দক্ষতা অর্জনে আরও গতিসঞ্চার একগুচ্ছ জরুরি পদক্ষেপ-এর কথা ঘোষণা করবে।

এটাও মনে রাখা দরকার যে শ্রমিক ছাঁটাই-এর ওপর কড়াকড়িটা কিন্তু একরকম নিষ্ক্রমণ-রোধক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া ভারতের সংস্থাগুলোকে সব সময়েই এই প্রত্যক্ষ নিষ্ক্রমণ-রোধকের সম্মুখীন হতে হয়েছে আধুনিক দেউলিয়া সংক্রান্ত আইনের অভাবে। এইসব নিষ্ক্রমণ-রোধক আবার অন্যদিকে নতুন নতুন সংস্থার, সে বাইরেরই হোক, কিংবা দেশের, ভারতের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করে। এই সমস্যাটা অবশ্য অনেক কমবে 'দেউলিয়া আইন সংস্কার' সংক্রান্ত আধুনিক আচরণ-সংহিতা রচিত হয়ে গেলে, অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণ অনুযায়ী, যা কিনা আইনি নিশ্চয়তা আর গতি আনবে আর যেহেতু আগামী অর্থবর্ষে এটা হবে ওঁর উচ্চ অগ্রাধিকার।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর শ্রম-আইনসমূহের প্রভাব

আগেই যেরকম বলেছি, বিভিন্ন রাজ্য কেন্দ্র দ্বারা রচিত শ্রম-আইনগুলোর নানা ধরনের সংশোধনী এনেছে। এছাড়া আইনের প্রয়োগটাও রাজ্যভেদে আলাদা রকমের। এতে রাজ্যে রাজ্যে শ্রম-বাজারের কঠোরতার ক্ষেত্রে কিছুটা বৈচিত্র আসে আর গবেষকরা এর খানিকটা সুযোগ নিতেও পারবেন।

বেসলি ও বার্জেস ২০০৪ সালে এমনই এক সমীক্ষায় রাজ্যওয়াড়ি উৎপাদনক্ষেত্রের চূড়ান্ত উৎপাদন, বিনিয়োগ, কর্মনিয়োগ এবং উৎপাদনশীলতা প্রভৃতির পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে কর্মী অনুকূল কোনও আইনের ক্ষেত্রে এই সব গুলিরই মান কমে। অসংগঠিত উৎপাদনক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান অবশ্য এই সব শ্রম আইনের সঙ্গে বিপ্রতীপ সম্পর্ক দেখায়, এটা বোঝাতে যে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রম-আইনের যেসব কড়াকড়ির কারণে বিকাশের যে বিষয়টি চাপা পড়ে যায় অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিকাশের সেই গতিই অনেক ওপরে উঠে যায়। পরবর্তী নানা সমীক্ষাতেও এ ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে।

হাসান, গুপ্তা ও কুমার ২০০৯ সালে রাজ্যের শিল্পের মান নিয়ে যে সমীক্ষা চালান তাতে দেখান যে সব রাজ্যে শ্রম-আইন তুলনামূলকভাবে কড়া সেখানে শ্রম-নিবিড় শিল্পের বিকাশহার এবং সার্বিক কর্মসংস্থানের হার অন্য রাজ্যের তুলনায় মন্থর। হাসান ও জ্যান্ডক সংগঠিত ও অসংগঠিত উৎপাদন-ক্ষেত্রের সংস্থাগুলি নিয়ে যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছিলেন সেখানে তাঁরা অবশ্য সংস্থাগত কর্মসংস্থানের নিরিখে কঠোর শ্রম-আইন আর অন্যদের মধ্যে কোনও তফাত খুঁজে পাননি। কিন্তু, কেবলমাত্র শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রের দিকে নজর কেন্দ্রীভূত করলে অবশ্য দেখা গেল যেসব সংস্থায় সর্বাধিক নয় জন পর্যন্ত কর্মী রয়েছেন তাঁদের সংখ্যাটি কড়া শ্রম-আইন (শ্রমিকমুখী) বিশিষ্ট রাজ্যে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। আর, ২০০-র বেশি কর্মীসংখ্যা যেখানে সেই সব সংস্থার ক্ষেত্রে অবশ্য ছবিটা একেবারে উলটো। তবে, উচ্চ ও নিম্ন পরিকাঠামো বিশিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে একই রকম তুলনা অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও ফলাফল দেখায়নি। তাদের সমীক্ষা থেকে একটা বেশ আকর্ষণীয় তথ্য উঠে এসেছে যে, ভারতীয় পোশাক শিল্পে যেখানে ৯ জন বা তার কম কর্মী বিশিষ্ট ছোট ছোট সংস্থারই প্রাধান্য সেখানে চীনা পোশাক শিল্পটা খুব বড় আকারের সংস্থা (২০০০ বেশি কর্মীসংখ্যা)-তে সীমাবদ্ধ।

দোহার্টি, ফ্রিসাঙ্কো রোবল্‌স ও কৃষ্ণর করা ২০১৪ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শ্রমনিবিড় শিল্পে এবং যেসব শিল্পে চাহিদা খুব বেশি রকম ওঠা-পড়া করে

সেখানে যেটির উৎপাদনশীলতা তুলনামূলক কম কঠোর শ্রম-আইন বিশিষ্ট রাজ্যে গড়ে ১১-১৪ শতাংশ বেশি।

শ্রম ও বিশ্বায়ন তত্ত্ব ও সাক্ষ্য

কড়া শ্রম-আইনের নেতিবাচক পরিণাম সম্পর্কে ওপরে দেওয়া প্রমাণ সত্ত্বেও ভারতে বাণিজ্য ও প্রত্যেক বিদেশি বিনিয়োগ ক্ষেত্রে বড় বড় সংস্কার, শ্রমনিবিড় শিল্পে ক্ষুদ্র মাপের সংরক্ষণের অবসান ঘটানো। ডিলাইসেন্সিং এবং মালটি-ফাইবার ব্যবস্থার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এদেশে শ্রম-নিবিড় সংস্থাগুলির তেমন দ্রুত বিকাশ ঘটছে না। এছাড়া দেশের জিডিপি-তে খাদ্য ও পানীয়, পোশাক, বস্ত্র, আসবাবপত্র প্রভৃতি অদক্ষ শ্রম-নিবিড় শিল্পের ভাগটা গত দু'দশকে মোটামুটি একই আছে অথবা খানিকটা কমেছে আর অন্যদিকে দক্ষতা-নিবিড় ও মূলধন-ভিত্তিক বেশ কিছু শিল্প যেমন গাড়ি, পেট্রোলিয়াম, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, টেলি-যোগাযোগ, ওষুধ, সফটওয়্যার ইত্যাদি অনেক দ্রুত তো বেড়েইছে আর রপ্তানিতে ওদের অংশটাও ১৯৯০-৯১-এর ৪১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৭-০৮-এ ৬৫ শতাংশ হয়েছে। এর বিপরীতে, ভারতে পর্যাপ্ত শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও পোশাক শিল্পে এদেশের অংশটা বিশ্ববাজারে খুব ধীরে ধীরে বাংলাদেশের কাছে আর খুব দ্রুত চীনের কাছে হারিয়ে যাচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে যে চীনে পোশাক শিল্প যেখানে খুব বড় বড় সংস্থা, কর্মীসংখ্যা ২ হাজার বা তার বেশি নিয়ে গঠিত, ভারতের ক্ষেত্রে তা ৯ বা তার কম কর্মীর নিতান্ত ছোট সংস্থায়-ই সীমাবদ্ধ। আবার এদেশের পোশাক শিল্পের হাল যে বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ সে ব্যাপারেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তুলনাটা এদেশের কড়া শ্রম আইনের নেতিবাচক ভূমিকার দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কড়া শ্রম-আইন কীভাবে এদেশের তুলনামূলক সুবিধা আর এদেশের শ্রম-নিবিড় সংস্থাগুলোর কাজকর্মকে বিশ্বের অন্য প্রান্তের তুলনায় বেশি প্রভাবিত করে? সরাসরি শ্রমের ব্যয় বেড়ে যাওয়া ছাড়াও, কড়া শ্রম-আইন সংস্থার আকার বাড়ার ওপরেও বাধা সৃষ্টি করে যেমন আগে বলা হয়েছে। শ্রম-নিবিড় সংস্থাগুলির ছোট ছোট আকার ওদের বড়মাপের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে আর তার ফলে ভারতের শ্রম-নিবিড় উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধাটা যায় কমে।

কিছু কিছু ব্যাখ্যাকার সম্প্রতি যে সব সিদ্ধান্ত করেছেন, তার বিপরীতে বলতে হয়, ওই সব আইনের সঙ্গে যুক্ত কর্মসংস্থান সীমাগুলিতে সংস্থাগুলিকে গুচ্ছবদ্ধ না করার ব্যাপারটা আদৌ একথা বোঝায় না যে ওই বাধা-নিষেধগুলি বাধ্যতামূলক নয়, শ্রম-নিবিড় সংস্থাগুলিতে বড়মাপের উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি নির্বাচনটা ওই সব বাধা-নিষেধে আটকে দেওয়াও হতে পারে। ছোটছোট মাপের উৎপাদনকৌশল বা উৎপাদনের ধরনটা হয়তো এমন একটা কর্মসংস্থানের সঙ্গে মেলে যেটা উদাহরণস্বরূপ, আইডিএ-র সীমার চেয়ে অনেক ছোট।

নিয়ন্ত্রণমূলক শ্রমআইন বিভিন্ন সংস্থাকে চাহিদা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রয়োজনীয় অদল-বদলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ব্যবসাক্ষেত্রে এটা দেশীয় সংস্থাকে যেখানে এসব বাধা-নিষেধ নেই, সেইসব দেশের সংস্থার মোকাবিলায় বাধাদান করে। নিয়ন্ত্রণমুখী শ্রম-আইন শিল্পের মধ্যে এবং একই শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে শ্রমের পুনর্বণ্টনে বাধা সৃষ্টি করে। এই সব আইন কোনও সংস্থাকে বিরাট সংখ্যক স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগেও নিরুৎসাহ করে তাদের বেশি সংখ্যক ঠিকা শ্রমিক ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগের দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়াও, এই আইনগুলি ওই সব সংস্থাকে শ্রমকে মূলধন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে অর্থাৎ, তারা যাতে আরও বেশি করে মূলধনে নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক শিল্পের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় মূলধন নিবিড় জাতীয় পণ্য উৎপাদন করে তারই ব্যবস্থা করে। তাই, এই সব শ্রম-আইনগুলির ভারতের পর্যাপ্ততা ভিত্তিক তুলনামূলক সুবিধা যেটা আসলে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন, তার বিরপীত মুখে কাজ করে আর এর দরুন ব্যবসায়িক লাভের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এবার আমরা দেখব শ্রম-আইন এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসার মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া এবং সংস্থার কাজকর্মের গুণগতমান নির্ণয়ে এই পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রভাব। ১৯৮৮-২০০০ সালের মধ্যে ১৫টি বড় রাজ্যে বিভিন্ন দুই অঙ্কবিশিষ্ট শিল্পে উৎপাদনশীলতার ওপর বাণিজ্য সংস্কারের প্রভাব পর্যালোচনা করতে গিয়ে মিত্র ও উরাল ২০০৮ সালে দেখেছিলেন যে, যেখানে তুলনামূলকভাবে শ্রমবাজার বেশি নমনীয় তার তুলনায় অন্য সব রাজ্যে এই প্রভাবটা ৩৩ শতাংশ বেশি। গুণগতভাবে একই প্রভাব দেখা গেছে কর্মসংস্থান, উৎপাদন, মূল সংযোজন, মূলধনি মজুত ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। তাই, ২০১৩ সালে সুন্দরম, আহসান এবং মিত্র যা দেখেছিলেন যে ব্যবস্থার উদারীকরণ কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও মূল্য সংযোজনকে কঠোর শ্রমবাজার সম্পন্ন রাষ্ট্রে নমনীয় শ্রমবাজার ভিত্তিক রাষ্ট্রের তুলনায় বেশি বাড়ায় অসংগঠিত ক্ষেত্রে, যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা ৫-এর বেশি, আর এটা আদৌ অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়।

আগেই যেমন বলা হয়েছে, ব্যবসা ও শ্রম-আইনের মধ্যে সম্পর্ক আরও ভালো বোঝা যায় তীব্রতার ওপর শ্রম-আইনের প্রভাব দেখলে কেননা তীব্রতার শর্তটা প্রাচুর্যের শর্তের সঙ্গে মিলে তুলনামূলক সুবিধা আর ব্যবসার বিশেষত্বটা ঠিক করে আর এই ভাবেই স্থির করে ব্যবসার মুনাফা। বিভিন্ন শিল্প আর দেশের নানা সময়ের পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখে হাসান, মিত্র আর সুন্দরম পেয়েছেন যে নিয়ন্ত্রণমূলক শ্রম-আইন থেকে শ্রম-বাজারে যে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে, বিশেষ করে নিয়োগও ছাঁটাই বিধি, ন্যূনতম মজুরি বিধি এবং কর্মহীনতা সংক্রান্ত সুবিধা, সবই উৎপাদনক্ষেত্রের নানা শিল্পে মূলধনি নিবিড়তা বৃদ্ধির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। বিশেষ করে অদক্ষ শ্রম-নিবিড় শিল্পে আর সেইসব শিল্পে যেখানে চাহিদা আর প্রযুক্তি নিয়ত পরিবর্তনশীল আর তার দরুন প্রায়শ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অদল-বদল করতে হয়। তাই, হাসান, মিত্র ও সুন্দরম দেখেছেন ভারত যে তার উন্নয়নের মাত্রা অনুযায়ী দেওয়া পূর্বাভাসের চেয়েও বেশি এমনকী চীনের থেকেও বেশি মূলধন-নিবিড় শিল্প ব্যবহার করে কাগজ ও মুদ্রণ, চর্ম, রাবার ও প্লাস্টিক, রাসায়নিক, অ-ধাতব খনিজ, বেস মেটাল, ধাতব দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি শিল্পে, তাতে আশ্চর্য হওয়া কিছু নেই।

শ্রম-বাজারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনশীল শর্ত, যেটা ব্যবসা ও শ্রম-বাজারের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে প্রভাবিত হয় তা হল বেকারত্বের হার। হাসান, মিত্র, রঞ্জন ও আহসান ২০১২ সালে দেখেছেন

যে ব্যবসার উদারীকরণের ফলে বেকারত্ব কমার ইঙ্গিত মিলেছে সেই সব রাষ্ট্রে যেখানে শ্রম-বাজারটা বেশ নমনীয় এবং এক্ষেত্রে প্রায় ৩৭ শতাংশ বেকারত্ব হ্রাসের প্রমাণ মিলেছে। বেকারত্বের ক্ষেত্রে এই ফলাফলটা হাসান, মিত্র আর রামস্বামীর ২০০৭ সালের সমীক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

ওই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সংস্কারের ফলে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটে কর্মসংস্থান কমানোর প্রবণতায় বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে আর এই দ্রুত সাড়া দেওয়ায় প্রবণতাটা ও তার বৃদ্ধি বেশি চোখে পড়ে সেই সব রাষ্ট্রে যেখানে শ্রমবাজার নমনীয় (অর্থাৎ যেখানে শ্রম-আইন তেমন কড়া নয়)। রডরিক ১৯৯৭ সালে যেমন তর্ক তুলেছিলেন, এই সাড়া দেওয়াটা শ্রমিকদের দর-কষাকষির ক্ষমতার সঙ্গে বিপরীত সম্পর্কে যুক্ত আর ওই ক্ষমতাটা বাণিজ্যিক উদারীকরণের ফলে হ্রাস পায়। একটি মাধ্যম হল অনেক সরাসরি আর সেটার উদ্ভব হয় উপকরণের সুলভতা আর বিরাট বৈচিত্রের ফলে যেটা বাণিজ্যিক উদারীকরণের ফলে দেশীয় শ্রমের সাহায্যে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে। আর অন্য মাধ্যমটা অনেক বেশি সূক্ষ্ম, আর তার উদ্ভব ওই বিষয় থেকে যে দেশি তৈরি পণ্য বাণিজ্যিক উদারীকরণের ফলে বাইরে তৈরি পণ্যের সামনে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়ে। এর অর্থ, যে কোনও মজুরি বৃদ্ধি, সেটার দরুন খরচ ও সেই সঙ্গে দামটা বাড়ে, এখন সেটা চাহিদা সত্ত্বেও উৎপাদনের পরিমাণ অনেকটাই কমিয়ে দেয় আর তারই ফলে, কমে কর্মসংস্থানও। এটা এমনটি আলোচনার দ্বারা স্থির করা মজুরিও কমাতে পারে। বেকারত্বের বেশিরভাগ মডেলই যেমন বেকারত্বের হ্রাসের পূর্বাভাস দেয় এক্ষেত্রে। এই মাধ্যমটি তার পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষাকৃত নমনীয় শ্রম-বাজারের উপস্থিতিতে কাজ করে যাবে বলেই আশা করা যায়।

উপসংহারমূলক মন্তব্য : সুপারিশ ও ব্যঞ্জনা

ভারতের সেকেলে সব নিয়ন্ত্রণমূলক শ্রম-আইন এদেশের উৎপাদনক্ষেত্রের বিকাশে যে একটা গুরুতর প্রতিবন্ধক সেই মতের সপক্ষে সুস্পষ্ট ও কূলপ্লাবী প্রমাণ রয়েছে, বিশেষ করে উৎপাদনক্ষেত্রের মধ্যে থাকা শ্রম-নিবিড় সংস্থাগুলির ব্যাপারে। এই সব বিধিনিষেধের জেরে সংস্থাগুলো তাদের আকার বাড়াতে পারে না আর পরিণামে সেই সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়। ওরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মূলধন-নিবিড় উৎপাদন কৌশল অবলম্বনে বাধ্য হয় আর তার ফলে ভারতের পর্যাপ্ততা ভিত্তিক তুলনামূলক সুবিধার ক্ষেত্রটির বিপরীতে তাদের কাজ করতে হয়। তাছাড়া এই আইন অস্থায়ী ভিত্তির শ্রমিক নিয়োগে উৎসাহ জোগায়। ওই সব অস্থায়ী শ্রমিকদের কাজ শেখায় কোনও উৎসাহ থাকে না আর সংস্থারও তাদের ব্যাপারে বিনিয়োগের উৎসাহ দেখা যায় না। তাই ভারতের উৎপাদনক্ষেত্র, বিশেষত বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের মতো শ্রম-নিবিড় শিল্প বাংলাদেশ, চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি প্রতিযোগীর তুলনায় রীতিমতো অসুবিধার সম্মুখীন।

ভারতের বিপুল সংখ্যক কর্মপ্রার্থীকে ভালো কাজের সুযোগ করে দেওয়ার একমাত্র রাস্তা হল শ্রম-নিবিড় উৎপাদনক্ষেত্রকে প্রসারিত করা। ভারতে সম্প্রতি পরিষেবা-ক্ষেত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটে চলেছে ঠিকই কিন্তু এটা বিকাশের মূল চালক হতে পারে না একটা নির্দিষ্ট সীমার পর কেননা সেক্ষেত্রে শিক্ষিত কর্মীর অপর্যাপ্ততাটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। পরিষেবা-চালিত বিকাশের জন্য কর্মীবলের যে রূপান্তর প্রয়োজন সেটা আসতে আরও বেশ কয়েক দশক লাগবে। তাই শ্রম-নিয়ন্ত্রণ বিধির সংস্কারটাই এখন জরুরি।

কী ধরনের শ্রম-সংস্কার দরকার? শ্রম বিরোধ আইনের সীমাটা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০, সেটা রাজস্থান করেছে, হয়তো সুবিধাজনক হতে পারে কিন্তু এটাকে ধাপে ধাপে আরও বাড়ানো দরকার যাতে করে শেষ পর্যন্ত ওই সীমাটা একেবারে তুলেই দেওয়া যায়। আর সংস্কারকে অবশ্য শ্রম বিরোধ আইন-এর ৫-বি অধ্যায় পেরিয়ে যেতে হবে। অন্তত বেশিরভাগ ভাষ্যকারদের সেরকমই ধারণা। ওই অধ্যায়টির সংশোধন প্রসঙ্গে ভগবতী ও পানাগারিয়া ২০১৩ সালে যা বলেছেন, সেটা হল শ্রমিক ছাঁটাই-এর সংজ্ঞা থেকে চাহিদা হ্রাস পাওয়া বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে এবং প্রবেশনে থাকা কর্মীর নিয়োগের মজুরি না দেওয়ার জন্য কর্মীসংখ্যা কমানোটা বাদ দেওয়া। ওঁদের আরও বক্তব্য হল শিল্প-নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনটির সংশোধন ঘটিয়ে আরও নমনীয় করা হোক যাতে কোনও কর্মীকে তার যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা যায়।

একটি সংস্থার মধ্যে বহুসংখ্যক ইউনিয়ন না রাখারই পরামর্শ দেব কেননা তার ফলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দেয় যার দরুন উৎপাদনশীলতা বিরাটভাবে কমে যায়। যেমন বলা হয়েছে নতুন চালু করা বিধি মান্যতায় স্ব-নিবেদিত প্রতিবেদন ইন্সপেক্টর রাজ-এর অবসান ঘটাতে পারে। তবে এই প্রকল্পের আওতায় থাকা বিধির সংখ্যা বাড়াতে পারে।

ভারতের নিয়ন্ত্রণমূলক শ্রম-আইনগুলোর অর্থনৈতিক ব্যয়টা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হলেও সংস্কারটা রাজনৈতিকভাবে তেমন বাস্তবসম্মত নয় বলেই অনেকের ধারণা। শ্রমিক সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক সংগঠিত এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতেই তাদের অবস্থান। তবে সাম্প্রতিক বেশ কিছু ব্যাপার থেকে এটাও বোঝা যায় যে এই রাজনৈতিক বাধাটাকে অত বড় করে দেখার কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ, দেখা গেছে যে বাণিজ্যিক উদারতা যত বেড়েছে। শ্রমিকদের দর-কষাকষির ক্ষমতাটাও সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে কমেছে সেই সঙ্গেই আর তারই সঙ্গে ইউনিয়ন-মুক্ত হওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই, শ্রম-আইনের উত্তরোত্তর সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এই সব সংস্কারের রাজনৈতিক বিরোধিতা কমবে আর সংস্কারের পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থনও বাড়বে কেননা শ্রমিকরা নিজেরাই উপলব্ধি করবে যে সংস্কারের সুফল সব থেকে বেশি পাবে তারাই। ❑

[লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের সাইরাকিউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ম্যাক্সওয়েল স্কুল অব সিটিজেনশিপ অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স-এর ক্র্যামার অধ্যাপক। তিনি ইউরোপিয়ান ইকোনমিক রিভিউ, জার্নাল অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস, জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিকস প্রভৃতি বেশ কিছু পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক এবং ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্স পত্রিকার সহ-সম্পাদক।
email : dmitra@maxwell.syr.edu]

ভারতের আর্থিক বিকাশ ও উৎপাদনমুখী শিল্পের হকিকতনামা

উৎপাদনমুখী শিল্পের হাত ধরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র দূরীকরণের দ্বৈত উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমরা আশাবাদী। সম্ভাবনাময় এই পরিস্থিতিতে উৎপাদনক্ষেত্র ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থানের জোগান দিতে বাস্তবে কতটা সক্ষম জানাচ্ছেন **ড. প্রদীপ্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।**

'মেক ইন ইন্ডিয়া' (ভারতে এসে গড়ো)—এই যে আহ্বান ভারত সরকার দিয়েছে তাতে দেশের অর্থনীতিতে এক নতুন যুগ বা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে আশার সঞ্চার হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এবারের প্রাক্-বাজেট আর্থিক সর্বেক্ষণে বলা হয়েছে ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে বৃদ্ধির হার অধিকতর কৃষি উৎপাদনের দৌলতে শতকরা ৮ ভাগ হবার সম্ভাবনা। এমনকী কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (C.S.O) চলতি আর্থিক বছরে বৃদ্ধির হার শতকরা ৭.৪ ভাগ হবে বলে অনুমান করেছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, গত বছরের শুরুতে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী উৎপাদনমুখী শিল্পে মন্দগতির কথা বলেছিলেন, ''Manufacturing is the Achilles heel of the Indian economy. The deceleration in investment in manufacturing is particularly worrying.'' ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে উৎপাদনমুখী শিল্পে বৃদ্ধির হার শতকরা ০.২ অংশে নেমে আসে, যেখানে পূর্ববর্তী বৎসরে এই হার শতকরা ১.১ ভাগ ছিল। এটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। এই অবস্থায় ভারত সরকার বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করে—যার উদ্দেশ্য এই শিল্পের মন্দাভাব কাটিয়ে আর্থিক বিকাশের হারকে ঊর্ধ্বমুখী করা। একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, ১৮১টি দ্রব্য যা আমদানি করা হয়, সেগুলি দেশে উৎপাদনের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা গ্রহণ। এর ফলে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের মতো পরিকাঠামো, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, অটোমোবাইল শিল্প প্রভৃতি উৎসাহিত হবে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সংক্রান্ত (MSME) মন্ত্রক। নতুন শ্রম আইন প্রণয়নের কথাও ভাবা হচ্ছে, যাতে এই সুবিশাল কর্মকাণ্ডের সুবিধা হয়।

বিদেশি বিনিয়োগের মূল গন্তব্য হবে এই উৎপাদনমুখী শিল্পক্ষেত্র। মোবাইল ফোন, অটোমোবাইল ব্র্যান্ড প্রভৃতি শিল্প ভারতে তাদের কেন্দ্র গড়তে উৎসাহিত হবে। আশা করা যায়, 'দ্য ইলেকট্রনিক সিস্টেমস ডিজাইন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং' (ESDM) সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির সুফল ভোগ করবে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে শতকরা ৪৯ ভাগ করা হয়েছে। শিল্প-নীতি ও উৎসাহদান সংক্রান্ত বিভাগ (DIPP) বিভিন্ন আবেদনপত্র অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে।

ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট যে এটি সরলরেখায় চলেনি। ছিল অনেক বাঁক। এক সময় বৃদ্ধির হার এতই কম, গতি শ্লথ ও প্রায় স্থবির হয়েছিল যে, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ সেটাকে 'হিন্দু রেট অব গ্রোথ' (হিন্দু বিকাশ হার) আখ্যা দিয়েছিলেন। এর মূল বৈশিষ্ট্যটি হল মোট জাতীয় উৎপাদন, নাগরিকদের গড়পড়তা বার্ষিক আয় প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘকালীন নিম্ন হার। এশিয়ার অনেক দেশ, প্রধানত যাদের পূর্ব এশিয়ার বড় অর্থনৈতিক শক্তি বা 'ইস্ট এশিয়ান টাইগার্স' বলা হয়, তাদের তুলনায় ভারতের নেহাত অকিঞ্চিৎকর আর্থিক বৃদ্ধি অনেকের কাছে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে, ১৯৯১ সালে উদারীকরণ নীতি গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আর্থিক বৃদ্ধির হার শতকরা ৩.৫-এর কাছাকাছি থেকে গেছে। এর জন্য এক শ্রেণির অর্থনীতিবিদ লাইসেন্সরাজ ও জাতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রাধান্যকেই দায়ী করেছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ শৌরি মহাশয়ের ভাষায় 'because of those very socialist policies that their kind had swallowed and imposed on the country, our growth was held down to 3-4 percent, it was dubbed with much glee–as the Hindu rate of growth.' অর্থাৎ তাঁর মতে দেশে যে সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি এই ৩ থেকে ৪ শতাংশ হারে সীমিত বৃদ্ধি।

সে যাই হোক, উদারীকরণ নীতি ও বিশ্বায়নের পরে আর্থিক প্রেক্ষাপট অনেকটা বদলে গেছে। আর্থিক সংস্কারের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে দেশ চলছে এবং অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে নতুন নতুন নীতি প্রণয়ন ও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াল্ট হুইটম্যান রস্টো যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেলের কথা বলেছেন, তার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক

হবে। অধ্যাপক রস্টো পাঁচটি ধাপের কথা লিখেছেন, সেগুলি হল যথাক্রমে (১) পরম্পরাগত সমাজ (ট্র্যাডিশনাল সোসাইটি), (২) টেক-অফ পর্যায়ের নানা সূচক, (৩) টেক-অফ ধাপ, (৪) পরের ধাপ 'ম্যাচুরিটি' বা পরিণত অর্থনীতি এবং (৫) পরিশেষে 'এজ অব হাই মাস কনজামশন'।

প্রাচীন ঐতিহ্য-নিয়ন্ত্রিত সমাজে নীতি, পুরনো নিয়ম, দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ মানুষ নতুন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টার বিষয়ে নিদারুণ অনীহা দেখায়—এবং পরিচিত পদ্ধতির বাইরে যেতে অস্বীকৃত হয়। এ রকম ক্ষেত্রে সরকারকেই মূল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। শিল্প-নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার স্থির করে এগোতে হয়। নানা ক্ষেত্রে—তা সে সামাজিক, আর্থিক পরিকাঠামো নির্মাণ, প্রযুক্তির বিস্তার, তৎসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান স্থাপনা বা দক্ষতা বৃদ্ধিই হোক। এতে সব স্তরের নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক গতিময়তা বাড়ে। 'টেক-অফ' পর্যায়ের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা অধ্যাপক রস্টো উল্লেখ করেছেন তা হল—

(১) শিল্পায়নের অগ্রগতি, নগরায়ণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন।

(২) উৎপাদনমুখী শিল্পক্ষেত্রের বিস্তার। ফলে দ্রব্য-উৎপাদনকারী ক্ষেত্র অর্থাৎ মাধ্যমিক বা 'সেকেণ্ডারি' ক্ষেত্র ও কৃষি অর্থাৎ প্রাথমিক বা 'প্রাইমারি' ক্ষেত্রের অনুপাতে পরিবর্তন হয় এবং জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের অংশ বাড়ে।

(৩) এক ধরনের শিল্পবিপ্লবের সূচনা। তা সে যেকোনও বিশেষ বিশেষ শিল্পের হাত ধরে হতে পারে। যেমন গ্রেটব্রিটেনে মূলত বস্ত্রশিল্পের দৌলতে শিল্পবিপ্লব হয়েছিল।

অধ্যাপক রস্টোর মতে, এই 'টেক-অফ' পর্যায়ের জন্য তিনটি জিনিস জরুরি।

(১) The rate of productive investment should rise from approximately 5 percent to over 10 percent of National Income or Net National Product. অর্থাৎ উৎপাদনশীল বিনিয়োগকে জাতীয় আয় বা নিট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ থেকে ১০ ভাগে উন্নীত হতে হবে।

(২) The development of one or more substantial manufacturing sectors, with a high rate of growth. অর্থাৎ অধিক উন্নয়নের হার সহ এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনমুখী শিল্পের বিকাশ।

(৩) The existence or quick emergence of a political, social and institutional framework which exploits the impulses to expansion in the modern sector and the potential external economy effects of the take off. অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নির্মাণ করা হবে যা শিল্পায়ন ও আধুনিক অর্থনৈতিক বিকাশকে দ্রুততর করতে সক্ষম।

এই 'টেক-অফ' ধাপের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এক ঝাঁক উদ্যোগপতির উদ্ভব, যারা নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে আর্থিক বৃদ্ধি সুসংহত ও অধিকতর করতে সিদ্ধহস্ত। এদেরই কর্মকুশলতায় বড়-মাঝারি ও লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই উৎপাদনমুখী শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে ১২০ কোটি জনসংখ্যার দেশে যেখানে আগামী বছরগুলিতে কর্মক্ষম শ্রমজীবী মানুষ যথেষ্ট বাড়বে। একমাত্র উৎপাদনমুখী শিল্পই এই ক্রমবর্ধমান শ্রমজীবী জনসংখ্যাকে কাজ দিতে সক্ষম। বর্তমানে ভারতে সমগ্র কর্মনিয়োগের শতকরা ১২ ভাগ উৎপাদনমুখী শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত। এই কর্মসংস্থানের সুযোগই শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। আবার উৎপাদনমুখী শিল্পও যথোচিত বড় মাপের হওয়া চাই। কারণ যাকে 'ইকোনমি অব স্কেল' বলা হয়, তা হলে উৎপাদন খরচ কমে এবং বৃদ্ধির হার অধিকতর হতে পারে। এছাড়া বড় শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে অনুসারী মাঝারি ও ছোট শিল্প গড়ে ওঠে, এগুলি সব শ্রমনিবিড় বা 'লেবার ইনটেনসিভ' হয়। অধিক জনসংখ্যার দেশে এটা বিশেষ জরুরি। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে চীনের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—"চীনে এক সময় শ্রমনিবিড় শিল্প প্রচুর ছিল। কিন্তু সেগুলো সব বড় মাপের। ছোট-মাঝারিরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদি জোগান দেয়। কিন্তু কারখানাগুলো বিরাট ছিল। এইগুলোতেই ওদের চাকরির অনেক সুবিধা হয়েছে। পাশেই বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পে যেরকম উন্নতি করেছে, এ বঙ্গে সেটা হয়নি। ওই ধরনের শ্রমনিবিড় শিল্প এখানে কেন হল না, তা ভাবতে হবে।"

বস্তুত, বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, এমনকী ভারতের অগ্রসর রাজ্যগুলির ইতিহাসের দিকে তাকালে এটাই স্পষ্ট হয় যে, উৎপাদনমুখী শিল্পে জোর দিয়েই কর্মসংস্থান ও আর্থিক প্রগতি সম্ভব হয়েছে। চীন, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া আর ভারতে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যেও উন্নতি এই উৎপাদনমুখী শিল্পের হাত ধরেই।

বিগত শতকের নব্বই-এর দশকে ভারতে যে আর্থিক সংস্কার শুরু হল, তার ফলে অর্থনৈতিক ধাঁচার বড়সড় পরিবর্তন হল। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) এক বড় অংশ পরিষেবামূলক ক্ষেত্র থেকে এসেছে। উৎপাদনমুখী শিল্পের অংশ মাত্র ১৫ শতাংশের কাছাকাছি। এটা এশিয়ার উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশ কম। ওই সব দেশে এই ক্ষেত্রের যোগদান মোট জিডিপি-র ৩০ থেকে ৪০ ভাগ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের উৎপাদনমুখী শিল্পের যোগদান মাত্র ১.৮ শতাংশ। এটা নিঃসন্দেহে চিন্তার কারণ।

ভারতের এই সীমিত ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে চার ধরনের উৎপাদনমুখী শিল্প রয়েছে—

- প্রথম, প্রতিরক্ষা সাজ-সরঞ্জাম সংক্রান্ত শিল্প, বিভিন্ন মূলধনি দ্রব্য, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি কৌশলগত শিল্প।
- দ্বিতীয়, লোহা, সিমেন্ট আর নানা খনিজ পদার্থ সম্পর্কিত শিল্প।
- তৃতীয়টি হল—গাড়ি নির্মাণ, অটোমোবাইল, ঔষধ ও ভেষজ শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রনিক দ্রব্য, কাগজ, চিকিৎসা-সরঞ্জাম, কেমিক্যাল শিল্প ইত্যাদি। এটি একটি বড় ক্ষেত্র।
- চতুর্থটি হল—বস্ত্রশিল্প, খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ, চামড়া শিল্প, জেম ও অলংকার

শিল্প। এই সবই শ্রমনিবিড় ক্ষেত্র যাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে।

এই যে উৎপাদনমুখী শিল্পক্ষেত্র, তার বিকাশ সুনিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি নানা পদক্ষেপ সময় সময় নিয়ে চলেছে। কয়েকটি জ্বলন্ত সমস্যার আশু দূরীকরণের জন্য বিশেষ প্রয়াস জরুরি। মূলত, জমির সমস্যা, শ্রমিক অসন্তোষ বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনজনিত সমস্যা, রাস্তাঘাট, বন্দর নির্মাণ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রভৃতি পরিকাঠামোগত সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া, কারখানার মালিকানাজনিত সমস্যা, মূলধন, পণ্য-বাজারজাত করার বিষয়, সর্বোপরি শিল্প সংস্থানগুলিকে লাভজনক ও অর্থনীতির পক্ষে প্রগতির ইঞ্জিন হিসাবে পরিগণিত করার পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

বাস্তব সত্যটি হল, উৎপাদনমুখী শিল্পক্ষেত্র থেকে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ১৬ শতাংশ আসে এবং যেমন আগে বলা হয়েছে, দেশের সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রায় ১২ শতাংশ এক্ষেত্রে নিয়োজিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান 'ইউএস কাউন্সিল অন কমপিটিটিভনেস' যে 'গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং কমপিটিটিভ ইন্ডেক্স' (বিশ্বব্যাপী উদ্যোগশিল্প সংক্রান্ত প্রতিযোগিতামূলক সূচক) প্রস্তুত করে, তাতে দেখা যায় যে, ভারতের উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতামূলক আবহে যে কর্মকুশলতা দেখিয়েছে সে সম্পর্কে ২০১০ সালের রিপোর্টে ভারতের অবস্থান দ্বিতীয়। 'ইণ্ডেক্স স্কোর' অনুযায়ী চীন প্রথম। ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে ভারতের শিল্পক্ষেত্রের কার্যক্ষমতা মোটামুটি ভালো থাকলেও, এই ধারা পরবর্তীকালে বজায় থাকেনি। অর্থনীতিতে চাহিদা ও জোগান সম্পর্কিত নানা বাধা-বিঘ্নের প্রাবল্যই এর কারণ। ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪-এর আর্থিক বছরে শিল্পে উৎপাদন যথাক্রমে ১ শতাংশ ও ০.৪ শতাংশ মাত্র। এই অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবন রীতিমতো এক কঠিন কাজ। ক্ষেত্র অনুযায়ী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিল্প-উৎপাদনের নিম্নগতির মূল কারণ, খনিজ পদার্থ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধা ও তজ্জনিত সংকুচিত উৎপাদন ও অন্যান্য শিল্প-সামগ্রী উৎপাদনে ভাটা। ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত শিল্প ও অসংগঠিত শিল্প—দু ধরনের ব্যবস্থাই রয়েছে। রেজিস্ট্রীকৃত কোম্পানিগুলি সমগ্র উৎপাদনমুখী শিল্পক্ষেত্রের দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ অ-রেজিস্ট্রীকৃত উৎপাদন কারখানাগুলির দ্বারা উৎপন্ন। রেজিস্ট্রীকৃত কোম্পানিগুলি মোট জিডিপি-র ৯.৮ শতাংশ ছিল ২০০৪-০৫ আর্থিক বছরে। তা বেড়ে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে ১১.২ শতাংশ হয়। অরেজিস্ট্রীকৃত উৎপাদন শিল্পগুলির অংশ ২০০৪-০৫-এ ছিল ৫.৪ শতাংশ আর ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে তা কমে দাঁড়ায় ৪.৫ শতাংশ। অর্থমন্ত্রক থেকে প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩-১৪ অনুযায়ী এই শিল্পক্ষেত্রে প্রগতির নিম্নগতির কারণ চিহ্নিত করা গেছে। বিনিয়োগ কমে যাওয়া, অধিকতর সুদের হার, পরিকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি (হাইয়ার ইনপুট কস্ট), কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বাজারে ও বিদেশি বাজারে চাহিদা-হ্রাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে বর্ণিত সারণি থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই বিষয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট হয়।

উৎপাদনমুখী শিল্পের এই হাতাশাজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য ভারত সরকার ২০১১ সালে জাতীয় উৎপাদনমুখী শিল্প নীতি বা 'ন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং পলিসি' প্রণয়ন করেন। এর মূল উদ্দেশ্য দুটি—এক, জিডিপি-তে উৎপাদনমুখী শিল্পোৎপাদনের অংশ বাড়িয়ে অন্তত ২৫ শতাংশে উন্নীত করা এবং আগামী এক দশকে ১০০ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এই নীতিতে শ্রমনিবিড় শিল্প, যেখানে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে, যা 'ক্যাপিটাল গুডস্' (মূলধনি পণ্য) উৎপাদন করবে, যার প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে 'স্ট্র্যাটেজিক' গুরুত্ব রয়েছে, এবং যেখানে ভারতের পক্ষে তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে, আর ছোট, মাঝারি ও সার্বজনিক ক্ষেত্রে স্থাপিত শিল্পগুলিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া। নির্বাচিত স্থানে গুচ্ছ-শিল্প স্থাপন ও জাতীয় বিনিয়োগ ও উৎপাদন অঞ্চল বা 'ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং জোনস্' (NIMZ) প্রতিষ্ঠা এই নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরের মধ্যে ১৬টি NIMZ স্থাপন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮টি রয়েছে দিল্লি-মুম্বই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর (DMIC) বরাবর। বাকি ৮টির অনুমোদিত স্থান হল যথাক্রমে নাগপুর (মহারাষ্ট্র), চিত্তুর (অন্ধ্রপ্রদেশ), মেডাক (তেলেঙ্গানা), প্রকাশম (অন্ধ্রপ্রদেশ), টুমকুর (কর্ণাটক), কোলার (কর্ণাটক), বিদার (কর্ণাটক) ও গুলবার্গ (কর্ণাটক)। DMIC প্রকল্প ২০০৬ সালে শুরু করা হয় ভারত সরকার ও জাপান সরকারের মধ্যে এক 'MOU' স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে। "দিল্লি-মুম্বই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন" (DMICDC) এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করবে। জাপান ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সাহায্য ও 'কাটিং এজ' (অত্যাধুনিক) প্রযুক্তি দিয়ে এই প্রকল্প

সারণি-১
মাঝারি ও উচ্চ-প্রযুক্তি (MHT) উৎপাদন শিল্প

দেশ	জিডিপি-তে উৎপাদন শিল্পের অংশভাগ	মোট উৎপাদনে MHT-র অংশভাগ	মোট রপ্তানিতে MHT-র অংশভাগ	বিশ্ব রপ্তানিতে মোট রপ্তানির অংশভাগ
চীন	৩৪.১	৪০.৭	৫৯.৯	১৪.৬
দক্ষিণ কোরিয়া	২৭.৭	৫৩.৪	৭১.৮	৪.৩
থাইল্যান্ড	৩৬.৬	৪৬.১	৫৮.০	১.৫
জাপান	২০.৫	৫৩.৭	৭৯.০	৬.০
জার্মানি	১৯.২	৫৬.৭	৭২.০	১০.৪
ভারত	১৪.৯	৩২.২	২৭.০	২.০

সূত্র : রাষ্ট্রসংঘের শিল্পোন্নয়ন সংস্থা UNIDO ও বিশ্ব ব্যাংক

রূপায়ণের অংশীদার হয়েছে। ২০০৮ আর্থিক বছর থেকেই DMICDC প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া আরও ৫টি করিডোরের কাজ চালু করা হচ্ছে। সেগুলি হল—চেন্নাই-বেঙ্গালুরু ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর (CBIC), বেঙ্গালুরু-মুম্বই ইকোনমিক করিডোর (BMEC), ইস্ট কোস্ট ইকোনমিক করিডোর (ECEC) যার মধ্যে রয়েছে ভাইজ্যাক-চেন্নাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর (VCEC) ও অমৃতসর-কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর (AKIC)। সরকার এই শেষোক্ত প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছে ২০১৪-র জানুয়ারি মাসে। 'ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর' দুধারে—এই AKIC স্থাপিত হবে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ—এই সাতটি রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাবে। এর জন্য অমৃতসর-কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (AKICDC) স্থাপনের বিষয়টিও অনুমোদিত হয়েছে।

এবার 'মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস সেক্টর' অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা যাক। MSME ক্ষেত্রের মধ্যে উৎপাদনমুখী শিল্পের অংশ শতকরা ৩১.৮ ভাগ। বাকি ৬৮.২ ভাগ সামগ্রিক শিল্পোদ্যোগের মধ্যে। এই অংশটি পরিষেবা (সার্ভিস) কেন্দ্রিকতার অন্তর্গত। এই ক্ষেত্রটির দিকে ভারত সরকার বিশেষ জোর দিয়েছে। এর জন্য সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর MSMEs সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স এবং একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ (কার্যদল) কাজ করছে। এগুলি নানা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন করে সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ বা উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেবে। বিচার্য বিষয়গুলি হচ্ছে ঋণ ও আর্থিক দিক খতিয়ে দেখা, প্রযুক্তি, যথার্থ পরিকাঠামো নির্মাণ, বাজারজাত করার পদ্ধতি নিরূপণ, প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার প্রভৃতি।

আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। MSME ক্ষেত্রকে উৎসাহ দিয়ে পরিধি বাড়িয়ে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য ভারত সরকার আরও কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছে। সেগুলি হল—

(১) টেকনোলজি সেন্টার সিস্টেমস্ প্রোগ্রাম;

(২) ইন্ডিয়া ইনক্লুসিভ ইন্নোভেশন ফান্ড;

(৩) ক্রেডিট লিঙ্কড্ ক্যাপিটাল সাবসিডি;

(৪) ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম;

(৫) প্রাইম মিনিস্টারস্ এমপ্লয়মেন্ট· জেনারেশন প্রোগ্রাম;

(৬) MSE ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম;

(৭) কর-বহির্ভূত সুযোগ-সুবিধা যাতে MSME-গুলি তিন বছরের জন্য ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

এছাড়াও সরকার অতি-ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বিশেষ সার্বজনিক সংগ্রহ নীতি (পাবলিক প্রোকিয়োরমেন্ট পলিসি) ঘোষণা করেছে। এই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রক, বিভাগ ও সার্বজনীন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের বাৎসরিক ক্রয়ের শতকরা ২০ ভাগ এই ছোট শিল্পোদ্যোগ থেকে করতে হবে। আবার এই ২০ শতাংশের মধ্যে ৪ শতাংশ এমন প্রতিষ্ঠান থেকে কিনতে হবে যাদের মালিক তফশিলি সম্প্রদায় ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক MSME মন্ত্রক, বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের সহযোগিতায় একটি ওয়ার্কশপ (কর্মশালা) আয়োজন করে এবং এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা ও প্রতিবন্ধক রয়েছে তাদের সম্যক মোকাবিলা করার বিভিন্ন উপায় ও পথের সন্ধান ও নির্দেশনা দেয়। ২০১৩-র জুন মাসে অনুষ্ঠিত এই ওয়ার্কশপ থেকে উদ্ভূত নানা পন্থা বিচার বিশ্লেষণ করার পর কয়েকটি স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শিল্প ও ব্যবসা-সংক্রান্ত বিধি ও আইনসমূহ পর্যালোচনা করে তাদের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পরিবর্তনের কথাও ভাবা হবে বলে স্থির করা হয়।

'গ্রস ক্যাপিটাল ফর্মেশন' (GCF) সম্পর্কিত তথ্য অনুযায়ী শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থির বিনিয়োগ (ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট)-এর হার বিগত কয়েক বছরে কমে গেছে। উৎপাদনমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য সারণি ২-এ আলোচিত।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (ফরেন ডায়রেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) বা FDI এই শিল্পক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে ভারতীয় অর্থনীতিতে মোট FDI-এর পরিমাণ ছিল ৩৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের তুলনায় শতকরা ৮ ভাগ বেশি। কম্পিউটার, সফ্টওয়ার, ওষুধ ও ফারমাসিউটিক্যাল, অটোমোবাইল শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, হোটেল নির্মাণ ও পর্যটন শিল্প বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ টানতে সমর্থ হয়েছে।

একথা অনস্বীকার্য যে উৎপাদনমুখী শিল্প কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। ভারতের মতো জনবহুল ও কর্মক্ষম প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের দেশে এই ক্ষেত্রকে যতভাবে উৎসাহিত করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার তা করতে সরকার দায়বদ্ধ। এই শিল্পক্ষেত্র আবার পরিষেবামূলক ক্ষেত্রকেও প্রভাবান্বিত করে। যাকে এক ধরনের 'মাল্টিপ্লায়ার (গুণক) এফেক্ট' বলা যায়। জাতীয় উৎপাদন নীতি অনুযায়ী উৎপাদনমুখী শিল্পক্ষেত্রে প্রতি এক জন কর্মী নিয়োগের ফলশ্রুতিতে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দু-তিনটি অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করে। এটাও অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মানবসম্পদ উৎপাদনমুখী শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে এটা অস্বাভাবিক নয়। এখানে কৃষিক্ষেত্র জিডিপি-তে স্বল্প অংশের জোগান দেয়। অথচ শ্রমজীবী মানুষের একটি বৃহৎ অংশ বিসদৃশভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত।

সারণি-২ : GCF বৃদ্ধি

GCF বৃদ্ধির হার (শতকরা)	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
উৎপাদনমুখী শিল্প	৩২.৯	৩৫.৩	২৭.৪	২৩.৮
রেজিস্ট্রীকৃত	২৭.৮	২৯.৬	২৩.৫	২১.৯
অ-রেজিস্ট্রীকৃত	৫.১	৫.৭	৩.৯	১.৯

সূত্র : কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (CSO)

জিডিপি-র মাত্র ১৪.৪ অংশ কৃষি থেকে আসে কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের শতকরা ৫৮.২ ভাগ কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই বৈপরীত্যকে মনে রেখে ভারতের বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য লাভজনক ও যতদূর সম্ভব উচ্চগুণসম্পন্ন কর্মসংস্থান। তাই উৎপাদনমুখী শিল্পক্ষেত্রই এই ব্যাপারে সর্বরোগহর মহৌষধির কাজ করতে পারে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে ২০২০ সালের মধ্যে ভারতে ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে থাকা কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাবে। বস্তুত, তখন মোট জনসংখ্যার ৬৩ ভাগই এই শ্রেণির মধ্যে পড়বে। এই পরিস্থিতি একাধারে সুযোগ ও কঠিন চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিতবাহী। সরকার ও সামগ্রিকভাবে সমাজের কাছে দায়িত্ব এসে পড়ে—কীভাবে এই বিশাল জনসংখ্যাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন মানবসম্পদের সঠিক প্রশিক্ষণ, অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও সম্ভাবনার ক্রমবিকাশ ও সর্বোপরি তার সদ্ব্যবহার। দক্ষতা নির্মাণ ও বিকাশের জন্য চাই এক সুশৃঙ্খল, যথাযথ ও সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার রূপায়ণ। এ বিষয়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পর্ষদ (ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল) এক বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। ২০২২ সালের মধ্যে ৫০০ মিলিয়ন লোককে বিশেষ দক্ষতা নির্মাণ ও বিকাশের আওতায় নিয়ে আসার যে লক্ষ্যমাত্রা তার শতকরা ৩০ ভাগই এই কাউন্সিলের মাধ্যমে পূর্ণ হতে পারে।

জাতীয় উৎপাদন নীতি (ন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং পলিসি বা NMP) ২০১১ অনুযায়ী উৎপাদনমুখী শিল্প ক্ষেত্রেই ২০২২ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োজিত হতে পারে। কিন্তু তার জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(১) যে সমস্ত শিল্প শ্রমনিবিড় তাদের উৎসাহদান। যেমন বস্ত্রশিল্প, কাগজনির্মাণ, বনজ দ্রব্য সংশ্লিষ্ট শিল্প। যে সমস্ত রাজ্যে অধিকতর অদক্ষ শ্রমিকের জোগান রয়েছে, যথা উত্তরপ্রদেশ, বিহার, সেখানে এই জাতীয় শিল্প গড়ে তোলা কাম্য।

(২) MSME-এর উপর গুরুত্ব আরোপ। এই ক্ষেত্র থেকেই মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৮ শতাংশ আসে। উৎপাদনমুখী শিল্প সামগ্রিক শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৪৫ ভাগ সরবরাহ করে এবং রপ্তানির শতকরা ৪০ ভাগ এই ক্ষেত্র থেকেই হয়। MSME ও SME-র ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ, করের ছাড় প্রভৃতি সুবিধা সহজতর করা একান্ত কাম্য। কারণ এর মাধ্যমেই দেশের অগ্রগতি ও জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হওয়া সম্ভব।

(৩) শ্রমসংক্রান্ত নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে এই শিল্প যাতে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয় তা দেখাও সরকারের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। প্রায় ৪৫টি জাতীয় শ্রম আইন যার মূল উৎস শিল্প-বিরোধ আইন (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপ্যুটস্ অ্যাক্ট), ১৯৪৮ আর বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রায় দুশো আইন—সব মিলিয়ে যাতে শ্বাসরুদ্ধ করা বাতাবরণ তৈরি না হয়, সে বিষয়ে সরকারের সহায়কের ভূমিকা পালন প্রয়োজন।

(৪) বিভিন্ন শিল্প সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যাতে আধুনিক ও যথাযথ হয় সেটাও জরুরি।

(৫) শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্য। শিল্প যাতে আজকের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকে, বিশেষত আন্তর্জাতিক স্তরে রপ্তানির ক্ষেত্রে, তার জন্য নিরন্তর প্রয়াস ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন গবেষণা ও উদ্ভাবন আবশ্যক।

এই আবহে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর উত্তরপূর্ব ভারতেও প্রগতির বিশেষত উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠার ঢেউ যে পৌঁছাবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। পরিকাঠামো উন্নয়ন এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হবে। এই রাজ্যগুলিকে ক্রমশ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা অব্যাহত। ত্রিপুরায় একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রকল্পের উদ্বোধন সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী করে এলেন। ছোট ছোট শিল্প সারা ভারতের তুলনায় এখনও পূর্বোত্তর ভারতে নেহাতই নগণ্য। শতকরা ১.৮৬ শতাংশ। MSME মন্ত্রক কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। যদিও তা নেহাতই অপ্রতুল।

সে যাই হোক, ভারত যে এক ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনাময় দেশ, যার বাজার বিশাল, তা অনেক উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড় বিনিয়োগকারীর কাছে অনেক সুযোগসুবিধার দ্বার উন্মোচন করেছে। ম্যাকিন্সে কোম্পানির এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতের উৎপাদনমুখী শিল্প এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছুঁতে পারে। মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ এ ক্ষেত্র থেকে আসতে পারে—এই সম্ভাবনা অমূলক নয়। সব মিলিয়ে ৯০ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানও এখান থেকে হতে পারে।

ভারতে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ, উচ্চতর প্রযুক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সুযোগ, সস্তায় দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর প্রাচুর্য এই দেশকে যে 'গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং পাওয়ার হাউস'-এ রূপান্তরিত করবে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

পরিশেষে অমিত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে মোক্ষম যে প্রশ্নটির মুখে আজকের অর্থনীতি, তা হল—'মেক ইন ইন্ডিয়া' ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির মূল সুর কী হবে—উৎপাদনমুখী শিল্প না পরিষেবা ক্ষেত্রের বিস্তার। সবদিক খতিয়ে দেখে এই পথই নির্দিষ্ট হচ্ছে যার পরিণতিতে সম্ভব হবে অর্থনীতির ব্যাপক বিস্তার ও কাঠামোর এক সাবলীল রূপান্তর। মানবসম্পদের সুষ্ঠু উপযোগ ও সদ্ব্যবহারে ভারতে হবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ও 'স্কিল ইন্ডিয়া'-র এক দৃঢ় ও অভূতপূর্ব সমন্বয়। ❑

[লেখক প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল, সমাচার, আকাশবাণী এবং প্রাক্তন প্রেস রেজিস্ট্রার, ভারত সরকার
email : bandyopk@yahoo.co.in
website : www.pradiptobandopadhyay.com]

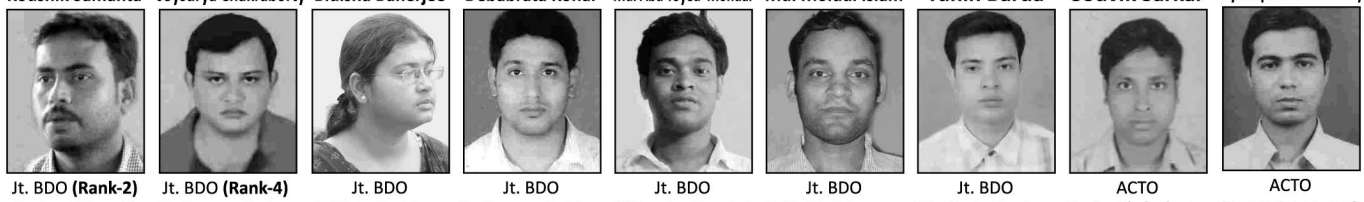

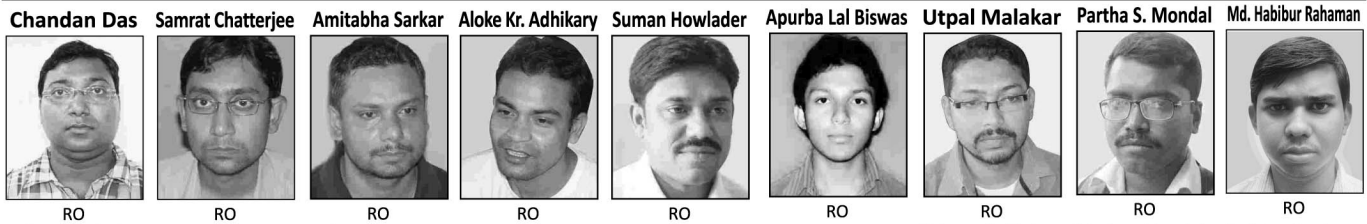

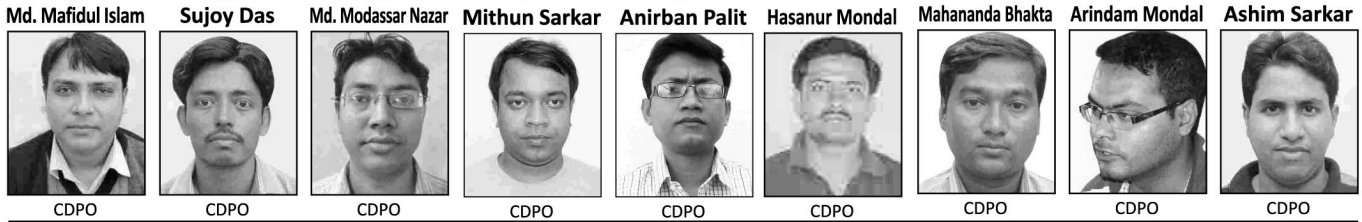

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন আবার
WBCS-2012 Gr-C-এর রেজাল্ট প্রকাশিত হল ২৪শে মার্চ
সাফল্যে নাম্বার ওয়ান
একটি মাত্র সেন্টার থেকে ৭৪ জনেরও বেশি প্রার্থী সফল
Koushik Samanta Jt. BDO (Rank-2)
Joysurya Chakraborty Jt. BDO (Rank-4)
Bidisha Banerjee Jt. BDO
Debabrata Konar Jt. BDO
Md. Abu Toyed Mondal Jt. BDO
Md. Moidul Islam Jt. BDO
Tuhin Barua Jt. BDO
Souvik Sarkar ACTO
Joydeep G. Chowdhury ACTO
Anjan Nandi ACTO
Sukanta Saha ACTO
Arijit Sadhukhan ACTO
Anshuman Baidya ACTO
Shibendu Mondal ACTO
Safin Bin Rahaman ACTO
Madhab Ch. Das RO
Sanjay Chakraborty RO
Soma Senapati RO
Jaydip Karmakar RO
Sanjay Show RO
Mayukh Chakraborty RO
Anirban Majumdar RO
Rohed Shaikh RO
Chandrani Gupta RO
Arnab Paul RO
Subhendu Das RO
Biswajit Satpathi RO
Gr-C ও D (WBCS-2013)-এর মক ইন্টারভিউ এবং গ্রুমিং ক্লাশ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই
Chandan Das RO
Samrat Chatterjee RO
Amitabha Sarkar RO
Aloke Kr. Adhikary RO
Suman Howlader RO
Apurba Lal Biswas RO
Utpal Malakar RO
Partha S. Mondal RO
Md. Habibur Rahaman RO
Md. Mafidul Islam CDPO
Sujoy Das CDPO
Md. Modassar Nazar CDPO
Mithun Sarkar CDPO
Anirban Palit CDPO
Hasanur Mondal CDPO
Mahananda Bhakta CDPO
Arindam Mondal CDPO
Ashim Sarkar CDPO
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
☑ মেনস-২০১৫-এর ব্যাচ শুরু হবে ৯ই মে থেকে। ☑ ডব্লুবিসিএস-২০১৬ -এর নতুন ব্যাচ শুরু হবে মে মাস থেকে। ☑ প্রিলি ও মেনসের জন্য পোস্টাল কোর্স চালু আছে।
প্রিলি-২০১৫-এর প্রশ্নের উত্তর এবং কাট অফ মার্কসের ওপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে ১০ই মে। উপস্থিত থাকবেন সামিম সরকার। নাম নথিভুক্ত করার জন্য ফোন করুন ৯৬৭৪৪৭৮৬৪৪ নম্বরে।
Academic Association
The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
9830770440
9674478644
Website: www.academicassociation.in ▪ Centre: Uluberia-9051392240 • Birati-9674555451 • Darjeeling-9832041123

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সদর্থক পদক্ষেপ নিতে গেলে অবশ্যই জোর দিতে হবে উৎপাদন শিল্পের উপর। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন **উৎপল চক্রবর্তী।** *পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় সম্পদ ও স্বল্প পুঁজির বিনিময়ে কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণের বাস্তব চিত্রটিও তুলে ধরা হয়েছে এই নিবন্ধে।*

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে শিল্পজাত উৎপাদন রপ্তানি, কর্মসংস্থান এবং উদ্যোগের ভিত্তি নির্মাণের প্রশ্নে ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক অতীতে দ্রুত উন্নয়নশীল প্রযুক্তি এবং বাজার-এর প্রশ্নে অর্থনৈতিক পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন এই জাতীয় শিল্পের সম্ভাবনাগুলিকে আরও প্রসারিত করেছে। যে বিষয়টি এই ক্ষেত্রটিকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে তা হল স্থানীয় সম্পদ এবং স্বল্প পুঁজির বিনিময়ে কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ। লক্ষ করে দেখা গেছে যে বৃহত্তর উদ্যোগ অপেক্ষা এই জাতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে শ্রম নিবিড়তা অনেক বেশি। এর ফলে যে কোনও অর্থনীতিতেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মোট উদ্যোগের ৮০ শতাংশেরও বেশি স্থান দখল করে রেখেছে এবং শিল্প উৎপাদন ও রপ্তানি-সহ সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করেছে।

ভারতে এই ক্ষেত্রটির আর্থ-সামাজিক অবদান অনেক দিন ধরেই গুরুত্ব-সহ বিবেচিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালে যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (ক) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ উন্নয়ন আইন, ২০০৬, (খ) খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন আইনের সংস্কার, (গ) ক্ষুদ্র উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের সুবিধা ঘোষণা, (ঘ) জাতীয় উৎপাদন সংক্রান্ত উদ্ভাবনীমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি ঘোষণা এবং (ঙ) প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান কর্মসূচি ঘোষণা। এই সমস্ত উদ্যোগেরই মূল লক্ষ্য ছিল সারা দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

সাম্প্রতিককালে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে শিল্প স্থাপন ভারতে সামগ্রিক শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংক্রান্ত চতুর্থ গণনা অনুযায়ী এই ক্ষেত্রটি ২৬.১ মিলিয়ন শিল্পোদ্যোগে মোট ৫৯.৭ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এই গণনা থেকে আরও যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি উঠে এসেছে তা হল, এই ক্ষেত্রটি সারা দেশের মোট উৎপাদনের ৪৫ শতাংশ দখল করে রেখেছে এবং দেশের মোট রপ্তানির ৪০ শতাংশ এসেছে এই ক্ষেত্র থেকে। আরও দেখা গেছে, ২৬ মিলিয়ন শিল্পোদ্যোগের মধ্যে, মাত্র ১.৫ মিলিয়ন নিবন্ধীকৃত এবং ২৪.৫ মিলিয়ন কোনও নিবন্ধীকরণ ছাড়াই সক্রিয় রয়েছে, অর্থাৎ এই জাতীয় শিল্পোদ্যোগের ৯৪ শতাংশই অনিবন্ধীকৃত। এই গণনা থেকে আরও দেখা যায় যে, এই ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির ৫৫ শতাংশই বিস্তারিত হয়েছে দেশের ৬টি রাজ্যে— উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটক। এছাড়াও, এই গণনা অনুযায়ী, মোট উদ্যোগের ৭ শতাংশ রয়েছে মহিলা মালিকানাধীন এবং ৯৪ শতাংশ রয়েছে একক মালিকানাধীন অথবা যৌথ মালিকানাধীন। মোট ৬,০০০ ধরনের উৎপাদনের সঙ্গে এই ক্ষেত্রটি যুক্ত রয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল খাদ্যসামগ্রী (১৮.৯৭ শতাংশ), বস্ত্র ও পোশাক (১৪.০৫ শতাংশ), মূল ধাতুজাত (৮.৮১ শতাংশ), রাসায়নিক দ্রব্য (৭.৫৫ শতাংশ), ধাতুজ উৎপাদন (৭.৫২ শতাংশ), যন্ত্রপাতি (৬.৩৫ শতাংশ), পরিবহণ সামগ্রী (৪.৫ শতাংশ), রাবার ও প্লাস্টিকজাত (৩.৯ শতাংশ) আসবাব সামগ্রী (২.৬২ শতাংশ) কাগজ ও তৎসংক্রান্ত সামগ্রী (২.০৩ শতাংশ), চর্মজাত (১.৯৮ শতাংশ)।

ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাসঙ্গিকতা

২০০৬ সালের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত আইন (মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬)-এ ভারতে সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে আইনগত স্বীকৃতি লক্ষ করা যায়। এই আইনের মাধ্যমে 'উদ্যোগ' বা 'উদ্যোক্তা' সংক্রান্ত ধারণারও প্রথম স্বীকৃতি উঠে এসেছে আইনের চৌহদ্দির মধ্যে। এই আইনে এই জাতীয় উদ্যোগকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(ক) উৎপাদন এবং (খ) পরিষেবা সরবরাহ। প্রতিটি বিভাগেই রয়েছে বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগের ধারণা। সারণি-১ থেকে এ বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে এই জাতীয় উদ্যোগকে ভারতে নানা কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হল সম্পদের সদ্ব্যবহারের দক্ষতা, কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং উদ্যোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা। সামাজিক দিক থেকেও এই জাতীয় উদ্যোগ ক্ষুদ্র শিল্পপতির ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতাকে অনেকটাই প্রসারিত করতে সহায়তা করে, কারণ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভবিষ্যৎ পরিণামের প্রশ্ন না রেখেই ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলার একটা প্রবণতা থাকে। এই প্রত্যাশা বৃহত্তর ক্ষেত্রে ততটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, যতটা সম্ভব ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রতর

ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, অতি ক্ষুদ্র পরিসরেও স্বাধীনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা অর্জন এক্ষেত্রে একটি বড় সামাজিক স্বাধীনতা। তৃতীয়ত, এই জাতীয় উদ্যোগে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও, বিশেষত যাদের অন্য কোথাও যুক্ত হবার সম্ভাবনা কম, যুক্ত করে নেওয়া সম্ভব হয়, সামাজিক দিক থেকে যেটি খুব বড় প্রাপ্তি। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই ক্ষেত্রটিকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এই কারণে যে, সাম্প্রতিককালে দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তিকে সদ্ব্যবহারের বিশেষ সুযোগ রয়েছে এই ক্ষেত্রটিতে, অতীতে যার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এছাড়াও বৃহত্তর শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবহণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা এই ক্ষেত্রটিতে বড় সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হয় না। নতুন প্রযুক্তিকে দ্রুত স্বাগত জানানোর মাধ্যমে, স্বল্প উৎপাদন ব্যয়ের সাহায্যে এই ক্ষেত্রটি অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নমনীয়তার প্রশ্নে বৃহত্তর শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই ক্ষেত্রটি ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে, সাম্প্রতিককালে এমনটাই মনে করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পনীতি

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্তরে ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালের জন্য একটি শিল্পনীতি গৃহীত হয়েছে। এই শিল্পনীতির প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে উৎপাদনশীলতার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে একটি নেতৃত্বপ্রদানকারী রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার সমস্ত সম্ভাবনাই এই রাজ্যে বর্তমান রয়েছে। এই সম্ভাবনা শুধুমাত্র এই রাজ্যে ব্যাপক সংখ্যক উদ্যোগের উপস্থিতির কারণেই নয়, এর প্রধান কারণ হল উৎপাদন এবং পরিষেবা, উভয়ক্ষেত্রেরই বৈচিত্রের মধ্যে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত উদ্যোগগুলি এই রাজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে তার মধ্যে রয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষিজাত শিল্প, চর্ম, রত্ন ও

সারণি-১
প্রতিটি বিভাগে বিনিয়োগের হার

উদ্যোগের ধরন	বিনিয়োগের ধরন (টাকা)		
	অতি ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্র	মাঝারি
উৎপাদন	২৫ লক্ষ পর্যন্ত	২৫ লক্ষ থেকে ৫ কোটি	৫ কোটি থেকে ১০ কোটি
পরিষেবা	১০ লক্ষ পর্যন্ত	১০ লক্ষ থেকে ২ কোটি	২ কোটি থেকে ৫ কোটি

অলংকার, খনিজ শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত, উৎপাদন শিল্প ও পরিষেবার ক্ষেত্রগুলি, ফলে এই ক্ষেত্রগুলিতে এই সময়কালে বৃহত্তর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

এই শিল্পনীতির সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হল পরিবেশনির্ভর একটি স্থায়ী ক্ষেত্র তৈরি করা যার মাধ্যমে সম্পদের চূড়ান্ত সদ্ব্যবহারই শুধু সম্ভব হবে না, পরবর্তী দশ বছরে এই রাজ্য সারা দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করবে। এই লক্ষ্যমাত্রাকে সফল করার জন্য এই নীতিতে সরকারি স্তরে আর্থিক, প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়তা-সহ বাজারের সঙ্গে উদ্যোক্তার যোগাযোগ বৃদ্ধিরও একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যেগুলির বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বাজারের সঙ্গে সংযোগের পরিমাণ এই সময়কালে আরও অন্তত ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হয়েছে। এছাড়াও এই উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এই সময়কালে অর্থাৎ পরবর্তী ১০ বছরে অতিরিক্ত ১০ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এই রাজ্যে, এমনটাই আশা প্রকাশ করা হয়েছে এই শিল্পনীতিতে। সরকারি স্তরে এই নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেবার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) ব্যবসার উপযোগী উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি।

(২) ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সরলীকরণ।

(৩) উদ্যোগ সৃষ্টি সংক্রান্ত সরকারি নিয়মনীতির সময়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

(৫) স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং সমবায় সমিতিগুলির এই জাতীয় উদ্যোগে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা এবং তার মাধ্যমে গ্রামীণ হস্তশিল্পের প্রসার ত্বরান্বিত করা।

(৬) ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে বৃহত্তর ব্যক্তিগত উদ্যোগের মেলবন্ধনের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগ সৃষ্টি করা।

(৭) প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন।

(৮) ওয়েব নির্ভর সহায়তা প্রদানের জন্য রাজ্য স্তরে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৯) ক্ষুদ্র শিল্পের উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির জন্য পর্যাপ্ত শিল্প এস্টেট স্থাপন।

(১০) জেলা স্তরে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগের সংঘ তৈরির সহায়তা প্রদান।

রাজ্যের এই শিল্পনীতিতে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমগ্র রাজ্যকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হল সার্বিক বা যুক্ত উন্নয়ন ('ইনক্লুসিভ গ্রোথ')-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলির জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি। সারণি-২ থেকে অঞ্চলভিত্তিক জেলাগুলির ধারণা পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা

প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক কারণেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সুদূর অতীত থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান করছে। শিল্পজাত ও ব্যবসায়িক সামগ্রীর ঐতিহ্যগত অভ্যন্তরীণ বাজার রয়েছে পূর্ব-ভারতে, উত্তর-পূর্বে বিশেষত সংলগ্ন নেপাল, ভুটান ও সিকিমে যার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এই রাজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুবিধাজনক। এছাড়াও এই রাজ্যটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দূর প্রাচ্যের প্রবেশ পথ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। কলকাতা ও বাগডোগরা বিমান বন্দর, কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর এবং ভবিষ্যতে কুলপি বন্দরকে গুরুত্ব-সহ বিবেচনা ও সেইসঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য দূরবর্তী

জেলায় অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর স্থাপনের ভাবনা এই রাজ্যে পরিবহণের সম্ভাবনা আরও বিস্তৃত করবে। এছাড়াও এই রাজ্যে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের সহজলভ্যতা, দক্ষ শ্রমিক ও মানবসম্পদের প্রতুলতা রাজ্যটিকে এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। রাজ্যের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে হস্তশিল্পের সুপ্রাচীন অবস্থান এবং দক্ষ ও সুনিপুণ শিল্পীদের কৃতিত্ব বহুযুগ ধরে এই রাজ্যের প্রতি অন্যান্য অঞ্চলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং রাজ্যের সাফল্যের মুকুটে একাধিক পালক যুক্ত করেছে।

ধাতুজ এবং কারিগরি শিল্পেও এই রাজ্যের কৃতিত্ব বহুদিন ধরে স্বীকৃত হয়ে আসছে। রাজ্যের নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করেই এই রাজ্যে খনি, পাট, চা, সিল্ক (রেশম), অলংকার শিল্প দীর্ঘদিন ধরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিককালে তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিনিয়োগ এবং উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে। এই সমস্ত উদ্যোগে আরও উৎসাহ সৃষ্টির জন্য পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের অধীনে একটি রপ্তানি উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে রাজ্যের উদ্যোগ সম্পর্কে এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের কাছে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা সম্ভব। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জেলা ও রাজ্য স্তরে সংগঠিত বিভিন্ন মেলার মাধ্যমেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বাণিজ্যিক প্রসারের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। ভারত সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরের শেষে পশ্চিমবঙ্গে এই জাতীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগের সংখ্যা ছিল ৩৪.৬৪ লক্ষ এবং এই উদ্যোগগুলিতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৮৫.৭৮ লক্ষ। অবস্থানগত হিসাবে সারা দেশের দশটি অগ্রণী রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। সারণি-৩ থেকে এই দশটি রাজ্যের তুলনামূলক অবস্থানের একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিবন্ধীকৃত উদ্যোগের জেলাভিত্তিক যে তথ্য পাওয়া যায়, তার থেকে দেখা যায় যে ২০১১-১২ আর্থিক বছরের অনুপাতে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ গুণেরও বেশি। আরও দেখা যায় ২০১১-১২ আর্থিক বছরে উত্তর ২৪-পরগনা জেলা ছিল রাজ্যের মধ্যে নিবন্ধীকৃত উদ্যোগ-এর ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে কিন্তু ২০১২-১৩ সালে কলকাতার অবস্থান রাজ্যের প্রথম স্থানে। সারণি-৪ থেকে এ বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

২০০৬ সালে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের পর থেকে উদ্যোক্তাদের প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশ (EM-II) জেলা শিল্প কেন্দ্রগুলিতে দাখিল করার সূচনা হয়। যদিও এই প্রতিবেদন দাখিল বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে রাজ্যের নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতির একটা ধারণা পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ২০০৭-০৮ থেকে ২০১২-১৩ সালের মধ্যে এই অগ্রগতি সমানভাবে ঘটেনি। ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের অনুপাতে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে বৃদ্ধির হার সামান্য বেশি হলেও ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সারণি-৫ থেকে এই বৃদ্ধি অথবা হ্রাস সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি-২
পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্প নীতির অধীন অঞ্চলভিত্তিক জেলা

অঞ্চল ক	অঞ্চল খ	অঞ্চল গ	অঞ্চল ঘ
কলকাতা পৌর এলাকা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়া জেলার সমগ্র পৌর এলাকা।	হুগলি জেলা, উত্তর ২৪-পরগনা জেলা (পৌর ও সুন্দরবন এলাকা বাদে); দক্ষিণ ২৪-পরগনা (পৌর ও সুন্দরবন বাদে), হাওড়া (পৌর এলাকা বাদে), শিলিগুড়ি পৌর এলাকা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পৌর এলাকা, পূর্ব মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া জেলার পৌর এলাকা।	বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, নদীয়া (সকলের ক্ষেত্রেই পৌর এলাকা বাদে), মুর্শিদাবাদ, মালদা, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং (শিলিগুড়ি পৌর এলাকা বাদে)।	বীরভূম জেলা, পুরুলিয়া জেলা, বাঁকুড়া জেলা, পৌর এলাকা বাদে পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকা।

সারণি-৩
ভারতের দশটি অগ্রণী রাজ্যের তুলনামূলক অবস্থান
(লক্ষ হিসাবে)

ক্রমিক নং	রাজ্য	নিবন্ধীকৃত উদ্যোগ	অনিবন্ধীকৃত উদ্যোগ	মোট উদ্যোগ	নিবন্ধীকৃত উদ্যোগে কর্মসংস্থান	অনিবন্ধীকৃত উদ্যোগে কর্মসংস্থান	মোট কর্মসংস্থান
(১)	উত্তরপ্রদেশ	১.৮৮	৪২.১৫	৪৪.০৩	৭.৫৫	৮৪.৮১	৯২.৩৬
(২)	পশ্চিমবঙ্গ	০.৪৩	৩৪.২১	৩৪.৬৪	৩.৬০	৮২.১৮	৮৫.৭৮
(৩)	তামিলনাড়ু	২.৩৪	৩০.৭৯	৩৩.১৩	১৪.২৬	৬৬.৭২	৮০.৯৮
(৪)	মহারাষ্ট্র	০.৮৭	২৯.৭৬	৩০.৬৩	১০.৮৯	৫৯.১৫	৭০.০৪
(৫)	অন্ধ্রপ্রদেশ	০.৪৬	২৫.৫	২৫.৯৬	৩.৮৩	৬৬.৮৬	৭০.৬৯
(৬)	কেরালা	১.৫০	২০.৬৩	২২.১৩	৬.২১	৪৩.৪১	৪৯.৬২
(৭)	গুজরাত	২.৩০	১৯.৪৮	২১.৭৮	১২.৪৫	৩৫.২৮	৪৭.৭৩
(৮)	কর্ণাটক	১.৩৬	১৮.৮৩	২০.১৯	৭.৮৯	৩৮.৮৩	৪৬.৭২
(৯)	মধ্যপ্রদেশ	১.০৭	১৮.২৬	১৯.৩৩	২.৯৮	৩০.৬৮	৩৩.৬৬
(১০)	রাজস্থান	০.৫৫	১৬.০৯	১৬.৬৪	৩.৪২	২৭.৩৭	৩০.৭৯

সূত্র : বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৩-১৪, এম. এস. এম. ই. বিভাগ, ভারত সরকার।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের ভবিষ্যৎ

পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েক বছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। এই ক্ষেত্রটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা মাথায় রেখে 'এক জানালা

পদ্ধতি' (সিঙ্গেল উইন্ডো সিসটেম)-সহ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বস্ত্র, অলংকার, ক্ষুদ্র কারিগরি ব্যবসা এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। সন্দেহ নেই, জাতীয় এবং রাজ্য স্তরে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক কর্মসংস্থান এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন-এর ক্ষেত্রে কৃষির অবদান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে, সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উদ্যোগ একদিকে যেমন কৃষি ক্ষেত্রের বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রেও সম্ভাবনাময় কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দিয়েছে। দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি এই উদ্যোগ সার্বিক বা যুক্ত উন্নয়ন (ইনক্লুসিভ গ্রোথ)-এর অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে এবং পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া এলাকায় তপশিলি জাতি, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের কাছে একমাত্র অথবা অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ এনে দিয়েছে এবং স্থানান্তর গমন (মাইগ্রেশন) প্রক্রিয়ার উপর বিপরীত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ এই ক্ষেত্রটির কাছে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতাও তৈরি করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব, স্বল্প মূলধন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অভাব এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে উৎপন্ন সামগ্রীর প্রতিযোগিতা। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির মতো এই রাজ্যেও এই জাতীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে আরও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হল নিবন্ধীকৃত সংস্থা অপেক্ষা অনিবন্ধীকৃত সংস্থার সংখ্যাধিক্য। এর ফলে জেলাস্তরে শিল্প কেন্দ্রগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারি সুযোগসুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা এবং অত্যাধুনিক দক্ষতা বৃদ্ধির যে সুযোগসুবিধা নিবন্ধীকৃত সংস্থাগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে, অনিবন্ধীকৃত সংস্থাগুলি সেক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে বাজার অর্থনীতির হাত ধরে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর বিনিয়োগকারী যে পছন্দের (চয়েস) বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিছক সরকারি সহায়তাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন বিভিন্ন স্তরের কার্যকরী সমন্বয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি। পশ্চিমবঙ্গের কার্যকরী উদ্যোগ আশা করা যায় সেই বৃহত্তর লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে উত্তীর্ণ হবার স্বপ্ন সফল করবে এবং এই রাজ্য সারা দেশের কাছে দিশারির ভূমিকা পালন করবে। ❑

[লেখক প্রাক্তন অনুষদ সদস্য, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।]

সারণি-৪
পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা	নিবন্ধীকৃত উদ্যোগের সংখ্যা		বাৎসরিক বৃদ্ধির সংখ্যা
		২০১১-১২	২০১২-১৩	
১।	বাঁকুড়া	৪১৯	১৬৮৭	১২৬৮
২।	বীরভূম	৩১০	২০২১	১৭১১
৩।	বর্ধমান	৫৭	৩৯১০	৩৮৫৩
৪।	কোচবিহার	৩৭০	১২৬৯	৮৯৯
৫।	দক্ষিণ দিনাজপুর	৬৩	৭০৩	৬৪০
৬।	দার্জিলিং	৭৭	১৫০২	১৪২৫
৭।	হুগলি	৫১৪	৩২৮৭	২৭৭৩
৮।	হাওড়া	১৪২৯	৯৪৮৯	৮০৬০
৯।	জলপাইগুড়ি	১১২৬	৩২৭৩	২১৪৭
১০।	কলকাতা	১৫২৭	১২৬০১	১১০৭৪
১১।	মালদা	১৬৯	২২২৬	২০৫৭
১২।	মুর্শিদাবাদ	১৪৭	২৯২৬	২৭৭৯
১৩।	নদীয়া	৭১৪	১৮৬৬	১১৫২
১৪।	পশ্চিম মেদিনীপুর	১০৭৮	২৬৬৬	১৫৮৮
১৫।	পূর্ব মেদিনীপুর	৭	৩০৭৩	৩০৬৬
১৬।	পুরুলিয়া	৩৫২	১২২১	৮৬৯
১৭।	উত্তর ২৪-পরগনা	১৭৫৫	৯০৬০	৭৩০৫
১৮।	দক্ষিণ ২৪-পরগনা	১০৫০	৫০৬৮	৪০১৮
১৯।	উত্তর দিনাজপুর	১৩০	১০০৫	৮৭৫
	মোট	**১১২৯৪**	**৬৮৮৫৩**	**৫৭৫৫৯**

সূত্র : এম. এস. এস. ই. অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও এম. এস. এস. ই. উন্নয়ন সংস্থা, কলকাতা।

সারণি-৫
উদ্যোক্তাদের প্রতিবেদন দাখিলের ভিত্তিতে নিবন্ধীকৃত উদ্যোগের বৃদ্ধি/হ্রাস

আর্থিক বছর	প্রতিবেদনের সংখ্যা	মোট কর্মসংস্থান (সংখ্যা)	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়)
চতুর্থ গণনা অনুযায়ী নিবন্ধীকৃত একক	৪২,৬৩৫	৩,৬৫,২২৮	৩,৩৮,০৫৪
২০০৭-০৮	১৭,৬১৮	১,৮৩,২৪২	১,৩৫,৯৪৬
২০০৮-০৯	১৩,৪১৫	১,৩৭,১৫০	১,২৬,৪১০
২০০৯-১০	১১,৬৬৮	১,৩১,৬৬৯	৮৯,৯৬৫
২০১০-১১	১০,০৯৯	১,২১,৯৪৪	৭৭,৭৮৮
২০১১-১২	১৩,৪৭০	—	—
২০১২-১৩	১০,৩৪২	—	—

সূত্র : এম. এস. এস. ই. অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের বার্ষিক প্রতিবেদন।

মেক ইন ইন্ডিয়ার জন্য বিশ্বজনীন উৎপাদন নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ

চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের বদলে পণ্য প্রস্তুতির কোনও একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের বিশেষায়ণে আগ্রহী হচ্ছে দেশগুলি। বিশ্ব উৎপাদন নেটওয়ার্কের আওতায় গড়ে উঠছে উল্লম্ব বাণিজ্য ও সরবরাহ শৃঙ্খল। দেশীয় শিল্পক্ষেত্রকে এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে ভারতের খামতি, তা কাটিয়ে ওঠার দিশা এবং এ সংক্রান্ত অমিত সম্ভাবনা উঠে এসেছে **সি বীরামণি**-*র এই নিবন্ধে।*

ভারতের অর্থনৈতিক নীতিসমূহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল উৎপাদনক্ষেত্রের দ্রুত বিকাশসাধন। ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচারাভিযান—নীতিনির্ধারকরা সব সময়েই উৎপাদনক্ষেত্রের বিকাশ ও বিস্তারে বিশেষ জোর দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটা মাথায় আসে তা হল, উৎপাদনক্ষেত্রের ওপর এই জোর কেন? আসলে কোনও দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিল্পায়নের ভূমিকা কতটা অপরিহার্য, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য রয়েছে। বিশেষত পূর্ব এশীয় দেশগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে, রপ্তানিনির্ভর শিল্পায়ন সেখানে কর্মসংস্থানের ধারাবাহিক সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণে কতটা সহায়ক হয়েছে। ভারতের মতো দেশে শ্রমনিবিড় উৎপাদনক্ষেত্রের বিকাশ, স্বল্পদক্ষ শ্রমের বাজার সৃষ্টির অপরিমেয় সম্ভাবনা খুলে দিতে পারে।

আটের দশক থেকে, জিডিপি-র বিকাশহারের নিরিখে ভারত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। তবে কৃষিক্ষেত্রের অতিরিক্ত শ্রমিককে অকৃষিক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করার মতো কাঠামোগত পরিবর্তনের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। ২০১১-১৩ সময়কালে ভারতের জিডিপি-র ১৮.১ শতাংশ এসেছিল কৃষিক্ষেত্র থেকে, অথচ মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় ৪৮.৯ শতাংশ নির্ভরশীল ছিল কৃষির ওপর (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪-১৫)। কৃষির ওপর এই অত্যধিক চাপ, ভারতে দারিদ্রের অন্যতম মূল কারণ। প্রথাগত পথ অনুসরণ করে চীন সহ অন্য পূর্ব এশীয় দেশগুলি শ্রমশক্তিকে কৃষি থেকে শ্রমঘন উৎপাদনক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করার কাজে প্রয়াসী হয়। অন্যদিকে ভারত শিল্পায়নের অন্তর্বর্তী এই পর্যায় এড়িয়ে সরাসরি পরিষেবা ক্ষেত্র নির্ভর বিকাশে উদ্যোগী হয়েছে।

ভারতের উৎপাদনক্ষেত্রের বিকাশ ও কাঠামো: কিছু বৈসাদৃশ্য

ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের মূল চালিকাশক্তি হল পরিষেবা নির্ভর শিল্প, যেখানে নিযুক্ত শ্রমিকদের অধিকাংশই দক্ষ। সেজন্যই ২০১১-১৩ সময়কালে দেশের জিডিপি-তে উৎপাদনক্ষেত্রের ভাগ মাত্র ১৭.৮ শতাংশ। আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে তুলনা করলে দেখা যাবে, বাস্তবে এই হার পূর্বাভাসের থেকে আরও কম, চীনের ক্ষেত্রে যা আবার ঠিক বিপরীত। (ADB, ২০০৭)। ১৯৯২ সালে ভারতের রপ্তানির ৭৩.৫ শতাংশ হত উৎপাদনক্ষেত্রে। ২০১২ সালে এই হার কমে ৬৫ শতাংশে ঠেকেছে। অন্যদিকে, ২০১২ সালে চীনের জিডিপি-তে উৎপাদনক্ষেত্রের ভাগ ছিল ৩২ শতাংশ, রপ্তানিতে ৯৪ শতাংশ। ১৯৯২ থেকে ২০১২—এই দুই দশকে চীনের রপ্তানির হার আড়াই থেকে বেড়ে ১৬.৮ শতাংশে পৌঁছেছে। সেদিকে ভারতের গতি বেশ ধীর। ০.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে এই হার গেছে ১.৬ শতাংশে।

উৎপাদনক্ষেত্রের মধ্যে ভারত অপেক্ষাকৃত দক্ষ ও মূলধন নিবিড় শিল্পগুলিতে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। যেসব শিল্পের রপ্তানি দ্রুতহারে বাড়ছে, সেগুলি হয় দক্ষ শ্রমনির্ভর, (যেমন ওষুধশিল্প, রাসায়নিক) অথবা মূলধন নিবিড় (যেমন গাড়ি ও তার যন্ত্রাংশ)। ১৯৯৩ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে মূলধন নিবিড় পণ্যের ভাগ দ্বিগুণ বেড়ে ২৫ শতাংশ থেকে ৫৪ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। অন্যদিকে অদক্ষ শ্রমনির্ভর পণ্যের ভাগ ৩০ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১৫ শতাংশ। অর্থাৎ চীনের মতো কর্মসংস্থানভিত্তিক নয়, ভারতে উৎপাদনক্ষেত্রের বিকাশ হয়েছে মূলধন নিবিড় পথে। অদক্ষ শ্রমিক বিপুল পরিমাণে থাকায় শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রে ভারত যে তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করতে পারত, তার সাপেক্ষে বিচার করলে এই ঘটনাকে বেশ অস্বাভাবিক মনে হয়।

বিশ্বজনীন উৎপাদন নেটওয়ার্কের বিকাশ

শুল্ক সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা সহজ হওয়ায় এবং প্রযুক্তির কল্যাণে পরিবহণ খরচ কমে আসায় এখন এক দেশের উৎপাদিত শিল্পপণ্য অন্য দেশে বিক্রি করার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়েছে। আটের দশক থেকে বিশ্ব বাণিজ্যে আকার ও প্রকৃতিগত একটা বদল এসেছে। সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদনের বদলে

পণ্য প্রস্তুতির কোনও একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিশেষায়ণের আগ্রহী হচ্ছে দেশগুলি। সম্পূর্ণ পণ্যের থেকেও এখন খণ্ড পণ্যের বাণিজ্যের বিকাশহার অনেক বেশি। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ার জেরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ধারাবাহিক, উল্লম্ব যে বাণিজ্য শৃঙ্খলের সৃষ্টি হয়েছে তাকে খণ্ড বাণিজ্য, অন্তর্বর্তী পণ্যের বাণিজ্য, উল্লম্ব বিশেষায়ণ বাণিজ্য—এমন নানা নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

বিশ্বজনীন উৎপাদন নেটওয়ার্ক এমন এক ধারণা, যার মাধ্যমে একটি প্রধান সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা সরবরাহকারীদের জটিল সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। তুলনামূলক ব্যয়ের সুবিধা নিয়ে প্রতিটি দেশ উৎপাদন প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট কোনও অংশে বিশেষত্ব অর্জন করছে। এই বিশেষত্ব অর্জন আবার নির্দিষ্ট অংশের উপাদান ঘনত্ব ও উপাদান ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে।

বৈদ্যুতিন ও গাড়ির মতো শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ছোট ছোট সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত করা সম্ভব হচ্ছে প্রযুক্তির মাধ্যমে। যেসব দেশে উৎপাদনের উপাদানের ব্যয় কম এবং সম্পদ সহজলভ্য, সেখানে এক একটি অংশের উৎপাদন হচ্ছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার এই ভৌগোলিক বিভাজন, খণ্ড বাণিজ্যের পথকে আরও মসৃণ করেছে। চীনের মতো যেসব দেশে শ্রমসুলভ, তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার অদক্ষ শ্রমনিবিড় অংশে বিশেষায়ণ করেছে। এগুলিকে বলা হয় বা কারখানা অর্থনীতি। অন্যদিকে উৎপাদনের উপাদান যেখানে সুলভ, সেই দেশগুলি মূলধনঘন দক্ষ শ্রমনির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছে। এদের বলা হয় সদর দপ্তর অর্থনীতি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি উৎপাদন প্রক্রিয়ার দক্ষ ও জ্ঞাননির্ভর অংশগুলি সম্পন্ন করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানের মতো উন্নত দেশগুলিতে। অদক্ষ ও শ্রমনিবিড় অংশের কাজ করা হচ্ছে চীন, ভিয়েতনামের মতো দেশে, যেখানে মজুরির হার কম।

উৎপাদন নেটওয়ার্কের এই বিস্তার পৃথিবীব্যাপী হলেও, বিশেষত পূর্ব এশিয়া ও চীনে এর বিকাশ চোখে পড়ার মতো। রপ্তানি বাণিজ্যে পূর্ব এশীয় দেশগুলির সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে এই খণ্ড বাণিজ্য ও উল্লম্ব বিশেষায়ণ। চীন তার রপ্তানি উন্নয়ন নীতির অঙ্গ হিসাবে নয়ের দশক থেকেই বিশ্বজনীন উৎপাদন নেটওয়ার্কের সঙ্গে দেশীয় শিল্পক্ষেত্রকে সংযুক্ত করেছে। পূর্ব এশিয়ার মতো অতটা না হলেও ইউরোপে জার্মানি ও হাঙ্গেরির মধ্যে এবং উত্তর আমেরিকায় শক্তিশালী উৎপাদন নেটওয়ার্কের অস্তিত্ব রয়েছে।

বিশ্বজনীন উৎপাদন নেটওয়ার্কে চীনের অংশগ্রহণ খতিয়ে দেখলে রপ্তানি ক্ষেত্রে যন্ত্রাংশের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব নজরে পড়ে। ২০১০ সালে যন্ত্রাংশ ও পরিবহণ বিষয়ক সরঞ্জাম চীনের রপ্তানির প্রায় ৫২ শতাংশ অধিকার করে ছিল। সারা বিশ্বে এ সংক্রান্ত রপ্তানির ২০ শতাংশ চীন থেকে আসে। বিশ্বজনীন ও আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের মধ্যে চীন কতটা সুসমন্বিত সংযোগসাধন করতে পেরেছে, এই সাফল্য তার প্রমাণ। আমদানি করা যন্ত্রাংশের ওপর ভিত্তি করে চীন, বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন পণ্য একত্রীকরণের বিশ্বজনীন কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে যন্ত্রাংশ আমদানির পর জোড়া লাগিয়ে সম্পূর্ণ দ্রব্য হিসাবে চীন সেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে রপ্তানি করে। এক্ষেত্রে রপ্তানি করা পণ্যসামগ্রীর প্রতি একক নেট দেশীয় মূল্য সংযোজন খুব একটা বেশি না হলেও পরিমাণ বিপুল হওয়ায় মোট মূল্য সংযোজন যথেষ্ট হয়। একইসঙ্গে অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি বিশেষ সহায়ক।

বিশ্বজনীন উৎপাদন নেটওয়ার্কে ভারতের অংশগ্রহণ

অন্যদিকে উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধন নিবিড় দক্ষ শ্রমভিত্তিক পণ্যে ভারত বিশ্বজনীন ও আঞ্চলিক উল্লম্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তবে বিশ্বজনীন উৎপাদন নেটওয়ার্কের সঙ্গে ভারতীয় উৎপাদনক্ষেত্রের সংযোগ ততটা সুদৃঢ় না হওয়ায় এক্ষেত্রে বিকাশের হার কিছুটা মন্থর।

ক্রয়েজার বলেছেন, অদক্ষ শ্রমনির্ভর শিল্পগুলিতে বিদেশি লগ্নিকারীদের আকৃষ্ট করে নিজেকে রপ্তানিমঞ্চ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারত সফল হয়নি। আথুকোরালার মতে, চীন ও পূর্ব এশীয় দেশগুলির রপ্তানি সাফল্যের নেপথ্যে বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন সামগ্রীর ভূমিকা বিশাল। ভারত কিন্তু এক্ষেত্রে বিশ্বজনীন উৎপাদন নেটওয়ার্কের সঙ্গে দেশীয় শিল্পের সংযোগসাধনে ব্যর্থ হয়েছে। বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রের বেশ কিছু বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা ভারতে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছে বটে, কিন্তু সেখানে মূলত দেশীয় বাজারের জন্যই উৎপাদন হয়। তবে গাড়ি শিল্পের ক্ষেত্রে ছবিটা ভিন্ন। বৃহৎ গাড়ি নির্মাণ সংস্থাগুলি ভারতে যন্ত্রাংশ জোড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে বিশ্ব উৎপাদন নেটওয়ার্কে ভারতকে রপ্তানির ভিত্তিভূমি হিসাবে তুলে ধরছে। ২০০০ সাল থেকে ভারতে যন্ত্রাংশ জোড়া দিয়ে তৈরি সম্পূর্ণ গাড়ির রপ্তানির হার বিপুল হারে বেড়েছে। তবে গাড়ি রপ্তানির হার বাড়লেও খণ্ড বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষত বৈদ্যুতিন পণ্য রপ্তানিতে ভারত এখনও বেশ পিছিয়ে।

বিশ্ব উৎপাদন নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত পিছিয়ে কেন

শ্রমনিবিড় শিল্পায়নকে উৎসাহ না দেওয়ার নীতির কারণেই ভারত বিশ্ব উৎপাদন নেটওয়ার্কের সঙ্গে দেশীয় উৎপাদনের সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে অন্য দ্রুত বিকাশশীল দেশগুলির তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। ভারতের বিকল্প আমদানি নীতি বরাবরই মূলধন নিবিড় দক্ষতানির্ভর উৎপাদন পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে। ১৯৯১ সালের সংস্কারও এই ভারসাম্যহীনতা দূর করতে পারেনি। ১৯৯১ পরবর্তী নীতিগত পরিবর্তন, প্রবেশের বাধা দূর করে পণ্যের বাজারের উদারীকরণের পথে বহুদূর অগ্রসর হলেও শ্রম ও জমির বাজার এখনও নানা ত্রুটি ও অনমনীয়তায় পরিপূর্ণ। ভারতের শ্রম আইন, বৃহৎ সংস্থাগুলিকে শ্রমঘন উৎপাদন প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি অবলম্বনে নিরুৎসাহিত করে। শ্রমের বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপের জেরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়।

বিশ্ব উৎপাদন শৃঙ্খলের সঙ্গে চীনের উৎপাদনক্ষেত্রের সংযোগ সাধনে প্রত্যক্ষ

বিদেশি বিনিয়োগ বড় ভূমিকা নিয়েছিল। চীনের উৎপাদনক্ষেত্রে আসা বিদেশি বিনিয়োগের অধিকাংশই প্রকৃতিগতভাবে উল্লম্ব অর্থাৎ রপ্তানি উন্নয়নের জন্য ছিল। অন্যদিকে ভারতে আসা বিদেশি বিনিয়োগ প্রাথমিকভাবে অনুভূমিক অর্থাৎ বাজারের জন্য। চীন ও ভারতে আসা প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মধ্যে এই প্রকৃতিগত পার্থক্য কেন? প্রথমত, ১৯৯১ সালে কমানোর পরও ২০০৭ সাল পর্যন্ত ভারতের শুল্ক হার তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। পরবর্তীকালে শুল্ক হ্রাসের সুযোগ নিতে বহুজাতিক সংস্থাগুলি বাজারে বিনিয়োগ করতে থাকে। উচ্চতর শুল্ক হারের জন্য উল্লম্ব বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারত বিদেশি লগ্নিকারকদের কাছে খুব একটা পছন্দের জায়গা হয়ে উঠতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, ভারতের নিয়ন্ত্রণমূলক শ্রম আইন, অপ্রতুল পরিকাঠামো, বিধিবহুল দমচাপা পরিবেশ, অদক্ষ জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, দুর্বল বাণিজ্য কাঠামো প্রভৃতিও বিদেশি লগ্নিকারীদের উল্লম্ব বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করেছে। বিভিন্ন মাপকাঠির বিচারে পূর্ব এশীয় অঞ্চলে ভারতের স্থান অনেকটাই নীচে। বিশ্ব ব্যাংক বার্ষিক 'Doing Business 2015' মূল্যায়নে ১৮৯টি দেশের মধ্যে ভারতকে ১৪২তম স্থানে রেখেছে, যেখানে চীনের স্থান ৯০।

সামনের পথ

কম ব্যয়ের উৎপাদনস্থল হিসাবে চীনের যে ভাবমূর্তি ছিল, তা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। শ্রমিকের জোগানে টান, মজুরি বৃদ্ধির মতো নানা কারণের সম্মুখীন হয়ে চীন এখন প্রাথমিক উৎপাদন থেকে সরে এসে জটিলতর উৎপাদনক্ষেত্রে বিশেষায়ণের চেষ্টা চালাচ্ছে। সস্তায় শ্রমের জোগান পেতে চীনা সংস্থাগুলি এখন ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলির দিকে তাকাতে শুরু করেছে। এই প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি উঠে আসে, তা হল—ভারত কি পরবর্তী উৎপাদনকেন্দ্র হিসাবে নিজেকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারবে?

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য শক্তিশালী উৎপাদনক্ষেত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচারাভিযানের সূচনা করেছেন। বিশ্ব উৎপাদন নেটওয়ার্কের সঙ্গে দেশীয় উৎপাদনক্ষেত্রের নিবিড় সংযোগসাধন এই প্রচারাভিযানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত। বিভিন্ন শিল্পের বিশ্বজনীন উল্লম্ব সরবরাহ শৃঙ্খলের মধ্যে থেকে উদ্যোক্তারা যাতে অবাধে নিজেদের পছন্দমতো ক্ষেত্র বেছে নিতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করা দরকার। আমদানি করা যন্ত্রাংশ জোড়া লাগিয়ে বৃহৎ উৎপাদন হাবে পরিণত হবার অসীম সম্ভাবনা ভারতের রয়েছে। তবে চূড়ান্ত পণ্যের ওপর উঁচু হারে শুল্ক যাতে চাপানো না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দেশীয় সংস্থা, বিদেশি বিনিয়োগকারী, যৌথ উদ্যোগ—সকলেই যাতে সমান সুযোগ পায়, তা দেখা দরকার।

ভারতে শ্রমনিবিড় উৎপাদনক্ষেত্রের বিকাশে যথাযথ সামাজিক সুরক্ষা সহ নমনীয় শ্রমের বাজার, এক অপরিহার্য শর্ত। রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলিতে শ্রম আইনে যেসব সাম্প্রতিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা সঠিক দিশায় এক পদক্ষেপ। ❑

[লেখক মুম্বাইয়ের ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ-এর সহযোগী অধ্যাপক।
email : veeramani@igidr.ac.in]

ভারতের উৎপাদনক্ষেত্র, উদ্যোগ-বৈচিত্র ও কর্মসংস্থান

উন্নত দেশগুলিতে অর্থনীতি মূলত উৎপাদন ও পরিষেবাক্ষেত্র-নির্ভর। ভারতীয় অর্থনীতির মতো কর্মসংস্থানের জন্য কৃষি-নির্ভরতাও চোখে পড়ে না। বর্তমানে এদেশে পরিষেবাক্ষেত্র দ্রুতগতিতে প্রসারিত হচ্ছে বটে, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের অগ্রগতির জন্য আখেরে উৎপাদন শিল্পের বিকাশই যে অত্যাবশ্যক—এ কথা অনস্বীকার্য। উৎপাদন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন করতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, এই নিবন্ধে তার পর্যালোচনা করছেন **ভব রায়।**

বর্তমান বিশ্বের যে কোনও উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান দুটি ক্ষেত্র হল শিল্প এবং পরিষেবা। আবার, যে নানাবিধ উপক্ষেত্র দিয়ে সামগ্রিকভাবে 'শিল্পক্ষেত্র' গঠিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে ব্যাপ্তি ও অনুপাতে যেটি সবচেয়ে গুরুত্ববাহী, সেটি হল উৎপাদনক্ষেত্র, প্রায় সব দেশের শিল্পক্ষেত্রের সামগ্রিক পরিসরেই উৎপাদনক্ষেত্রের এই সর্বাধিক গুরুত্বের (তার আয়তন বা পরিমাণ যা-ই হোক না কেন) বিষয়টি প্রযোজ্য। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা প্রয়োজন—উৎপাদনক্ষেত্র ছাড়া শিল্পক্ষেত্রের অন্যান্য মূল উপক্ষেত্র বা উপাদানগুলি হল খনি ও খননক্ষেত্র এবং নির্মাণক্ষেত্র।

যে কোনও দেশেরই জাতীয় অর্থনীতি তথা জাতীয় জীবনে উৎপাদন শিল্পের প্রভাব বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী। এই উপক্ষেত্রটি একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট দেশের সামগ্রিক শিল্পক্ষেত্রের সমৃদ্ধি ও পশ্চাদগতির বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে; সেই সঙ্গে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-তে আনুপাতিক ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। সর্বোপরি, যে কোনও দেশের সামগ্রিক কর্মসংস্থান বা মোট কর্মীবাহিনীতে রয়েছে উৎপাদনক্ষেত্রের শ্রমিক ও কর্মী সমষ্টির এক অতি উল্লেখযোগ্য আনুপাতিক ও পরিমাণগত অবদান। আর, সারা দেশে গোটা বছর ধরে বহুবিধ চলমান উৎপাদন চক্রের একদিকে যেমন রয়েছে নানা পর্যায়ের অসংখ্য শ্রমিক ও কর্মী, অন্যদিকে প্রায়শই অপ্রকাশ্য যে 'চক্রী' বা চালিকা শক্তি কাজ করে চলে, সেই বিমূর্ত অথচ অবিরাম সক্রিয় পরিসরটিকে বলা হয়ে থাকে 'উদ্যোগ'-বলয় (বা অন্ত্রপ্রেনরশিপ)।

উৎপাদনক্ষেত্রের এই সাধারণ ভূমিকাকে মনে রেখে ভারতের পটভূমিতে উৎপাদন-শিল্প উদ্যোগ-কর্মসংস্থান, এই ত্রিমুখী আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তবে, বিস্তারিত আলোচনার যাওয়ার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্য মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে: ২০১২-১৩ সালে ভারতের সামগ্রিক জিডিপি-তে স্বতন্ত্রভাবে উৎপাদনক্ষেত্রের অবদান বা অনুপাত ছিল ১৫ শতাংশেরও বেশি, পাশাপাশি অন্যান্য শিল্পের ও কৃষির অবদান ছিল ২৭ শতাংশ এবং ১৪ শতাংশের কাছাকাছি। আর, ২০০৮ থেকে ২০১৩—এই পাঁচ বছরের সময়সীমায় গড় সামগ্রিক জিডিপি-র বার্ষিক বৃদ্ধির সাপেক্ষে উৎপাদনক্ষেত্রের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৮ শতাংশ, যা কৃষি ও শিল্পের বৃদ্ধির চেয়ে বেশি। আর দেশের সাম্প্রতিক (২০১২) মোট কর্মসংস্থানে কৃষি বাদ দিয়ে মোটামুটিভাবে যে ৪৮ শতাংশ মানুষ রয়েছে, তার মধ্যে প্রায় ১২ শতাংশই উৎপাদনক্ষেত্রে কর্মরত। জিডিপি ও কর্মসংস্থানের ভারতীয় মানচিত্রে একনজরে এই তথ্যগুলি দেখলেই সামগ্রিক ভারতীয় অর্থনীতির এই ক্ষেত্রটির গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়।

উৎপাদনক্ষেত্র—আরও অনুসন্ধান

ভারতীয় অর্থনীতির পটভূমিতে উৎপাদন শিল্পক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে জানতে হলে আরও কিছু আনুষঙ্গিক তুলনামূলক তথ্য-পরিসংখ্যান ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। এই সূত্রে প্রথমেই দেখা যেতে পারে, সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, স্বতন্ত্রভাবে ভারতের সামগ্রিক শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশিল্পের প্রকৃত 'ভার' বা ওজন (ওয়েট)-এর অনুপাত ঠিক কতখানি, তা নির্দেশিত হয়ে থাকে সরকার নির্ধারিত 'শিল্প উৎপাদন সূচক' (IIP)-এর মাধ্যমে। ১৯৯৩-৯৪ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে IIP অনুসারে, এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে সারণি-১ থেকে।

দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রতিককালে দেশের সামগ্রিক শিল্পক্ষেত্রের মোট উৎপাদনের মধ্যে উৎপাদন শিল্পের উৎপাদন-ভার ৭৫ শতাংশের বেশি, যে অনুপাত আগের বছরগুলিতে ছিল আরও বেশি। এখানে, আর একটি কথা বলার আছে। সারণি-ভুক্ত এই হিসাবের বাইরে রয়েছে অগণিত অসংগঠিত উৎপাদন শিল্পোদ্যোগের (যেখানে কর্মীর সংখ্যা ৫০-এর নীচে) উৎপাদনের পরিমাণ, যা পূর্বোক্ত হিসাবের মধ্যে ধরলে সংশ্লিষ্ট ভার অনেকটাই বেড়ে যাবে।

উৎপাদনক্ষেত্রের এই আপেক্ষিক-ভার চিহ্নিতকরণের সূত্র ধরে আরও একটি পরিসংখ্যানমূলক তথ্য তুলে ধরা যেতে পারে, যেখানে অন্তত পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হবে এই ক্ষেত্রটির ভিন্নতর লক্ষণ। আর এই বিষয়টির সঙ্গে অনেকটাই জড়িত রয়েছে উদ্যোগ-কুশলতার (অন্ত্রপ্রেনরশিপ) সফল প্রয়োগ। এটি হল—বৎসর-পরম্পরায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের মূলধন-গঠনের (ক্যাপিটাল ফর্মেশন) ক্রম বৃদ্ধি, যা আবার সেই ক্ষেত্রের সমৃদ্ধিরও

পরিচায়ক। পরবর্তী তুলনামূলক সারণি-২ লক্ষ করলে উৎপাদন-ক্ষেত্রের এই ইতিবাচক প্রবণতাটি আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে।

সারণি-২-এর বিভিন্ন পরিসংখ্যান খুঁটিয়ে বিচার করলে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, ২০০৫ থেকে ২০১২ পর্যন্ত মোটামুটি এই ৭ বছর দেশের সমগ্র শিল্পক্ষেত্রের গড় বার্ষিক মূলধন-গঠন বৃদ্ধির সাপেক্ষে নিবন্ধীকৃত (রেজিস্টার্ড) ও অনিবন্ধীকৃত (আন-রেজিস্টার্ড) মিলিয়ে উদ্যোগক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধির হার বরাবরই অনেকটা বেশি ছিল। এই প্রবণতা যে উৎপাদন শিল্পের ক্রমোন্নত বা সমৃদ্ধতর স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারতের উদ্যোগক্ষেত্রের অধিকতর গুণগত ও পরিমাণগত ভূমিকা এবং সফলতর উদ্যোগ-কুশলতার তথ্য-পরিসংখ্যানভিত্তিক এই পর্যালোচনার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এই ক্ষেত্রের কর্মসংস্থানের দিকটিও। তাহলেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এই ক্ষেত্রটির একটি সু-সমন্বিত তথা পূর্ণাঙ্গ চিত্র। কর্মসংস্থানের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সারণি-৩-এ।

সারণি-৩-এ লক্ষণীয়, ১৯৯৩ থেকে সাম্প্রতিক পর্ব পর্যন্ত মোটামুটি এই দুই দশকে ভারতে কৃষির বাইরে অন্যান্য সবক্ষেত্র মিলিয়ে যে মোট কর্মীবাহিনী রয়েছে, তার ২৫ শতাংশ বা তারও বেশি শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ উদ্যোগ-শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত। অন্য কোনও ক্ষেত্র বা উপক্ষেত্রে এককভাবে কর্মরত মানুষের সংখ্যা বা অনুপাত এর ধারে-কাছেও নয়। আরও যা উল্লেখ্য, ১৯৯৩ বা তারও আগের বছরগুলি থেকে সাম্প্রতিক পর্ব (২০০৫) পর্যন্ত, কয়েক দশক ধরেই বৎসর-পরম্পরায় এই ক্ষেত্রটিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার বেড়েই চলেছে। শুধুমাত্র ২০০৬ থেকে অতি-সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে বৃদ্ধির হার ঈষৎ কমেছে। অন্যদিকে, সংখ্যাগত হিসাব সূত্রেও দেখা যায়, ১৯৯৩-৯৪ সালে উদ্যোগক্ষেত্রে কর্মরত মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৯.৮৬ মিলিয়ন, যা ১৯৯৯-২০০০ সালে বেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল ৪৩.৯৬ মিলিয়ন এবং ২০০৪-০৫ সালে আরও বেড়ে হয়েছিল ৫৫.৯৪ মিলিয়ন। এই সময়ের পর থেকে অবশ্য বৃদ্ধির হার সামান্য কমতে শুরু করেছিল এবং ২০০৭-০৮ ও ২০০৯-১০ সালে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৪.৯৬ মিলিয়ন ও ৫০.৫৮ মিলিয়ন।

সারণি-১
১৯৯৩-৯৪ সিরিজ ও ২০০৪-০৫ সিরিজের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

ক্ষেত্র	সংখ্যা		ভার বা ওজন	
	১৯৯৩-৯৪	২০০৪-০৫	১৯৯৩-৯৪	২০০৪-০৫
খনি শিল্প	৬৪	৬১	১০৪.৭৩	১৪১.৫৭
উৎপাদন শিল্প	৪৭৩	৬২০	৭৯৩.৫৮	৭৫৫.২৭
বিদ্যুৎ শিল্প	১	১	১০১.৬৯	১০৩.১৬
মোট	৫৩৮	৬৮২	১০০০.০০	১০০০.০০

সূত্র : আর্থিক সমীক্ষা (২০১০-১১ ও ২০১১-১২), ভারত সরকার।

সারণি-২
২০০৪-০৫ মূল্যস্তরে গড় বার্ষিক হার (%)

শিল্পক্ষেত্র	২০০৫ থেকে ২০০৮	২০০৯ থেকে ২০১২
খনি শিল্প	২২.৯	৩.৮
উৎপাদন (নিবন্ধীকৃত)	২৯.১	২.১
উৎপাদন (অ-নিবন্ধীকৃত)	৩.৫	৭.২
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ	১৭.৩	১২.৮
সমগ্র	২০.৮	৩.০

সূত্র : কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (CSO)।

সারণি-৩
বিস্তৃততর শিল্প-উপক্ষেত্রসমূহে কর্মরত মানুষদের আনুপাতিক সংখ্যা
(শতকরা হিসাবে)

উপক্ষেত্র	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৯-২০০০	২০০৪-০৫	২০০৭-০৮	২০০৯-১০
কৃষি	৬৩.৮	৫৯.৯	৫৬.৫	৫৫.৪	৫৫.১
খনি ও খনন শিল্প	০.৭	০.৬	০.৬	০.৫	০.৭
উৎপাদন শিল্প	১০.৭	১১.১	১২.২	১১.৯	১১.০
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ	০.৪	০.৩	০.৩	০.৩	০.২
নির্মাণ শিল্প	৩.২	৪.৪	৫.৭	৬.৫	৯.৬

সূত্র : 'ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি' (২২.১০.২০১১)।

তাহলে, সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র ইতিবাচক আপেক্ষিক ভার ও মূলধন-গঠনের নিরিখেই নয়, বেকারি ও কর্মহীনতার ভারে ন্যুব্জ ভারতের মতো সুবিশাল দেশের কর্মসংস্থানেও এই ক্ষেত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপরন্তু, অর্থনীতিতে নতুন নতুন উদ্ভাবনার সূত্রে নিত্য-নতুন ও বৈচিত্রময় কর্মসংস্থানের দরজাও খুলে দিচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ SME সাধারণভাবে দেশের 'ম্যানুফ্যাকচারিং'-পরিবারের অনুর্ভুক্ত হলেও, কয়েকটি কারণে এই বিশেষ শাখাটি আরও বেশি মনোযোগ ও গুরুত্ব দাবি করে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, সারা পৃথিবীতেই এবং বিশেষভাবে ভারতে SME-ক্ষেত্রটিকে সেভাবে কার্যকরী গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অথচ এই ক্ষেত্রটির এখনও রয়েছে প্রবল সম্ভাবনা। বিশেষ করে, সামগ্রিক শিল্প-উৎপাদন-সূচককে বাড়িয়ে তোলা এবং দেশের বেকার সমস্যা-সমাধানে এই ক্ষেত্রটি খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া, দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনা-আত্তীকরণে SME-পর্যায়ের শিল্প-ইউনিটগুলির রয়েছে সরল, সহজাত ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক এম এইচ বালাসুব্রমানিয়া এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন "এই উদ্যোগগুলির মধ্যে উদ্ভাবনের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে যার এখনও সদ্ব্যবহার হয়নি (শ্যামিনেড এবং ভ্যান লরিসডেন, ২০০৬)।

এর প্রধান প্রধান কারণ—ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি প্রকৃতিগতভাবে অনেক নমনীয়, সহজেই বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে এবং অনেক কিছুই সহজেই গ্রহণ করতে পারে। এগুলি কিন্তু বিভিন্ন উদ্ভাবন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি 'অত্যাবশ্যক গুণ' (হ্যারিসন এবং ওয়াটসন, ১৯৯৮)।" (যোজনা—নভেম্বর, ২০১৪)

এখন দেখা যাক, বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে ভারতে SME-গোষ্ঠীর ভূমিকা ও অবস্থান ঠিক কী রকম। ২০১২-১৩ সালে ভারতের মোট SME-শিল্প-ইউনিটের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৭ মিলিয়ন এবং এখানে কর্মরত মানুষের সংখ্যা ১০৬ মিলিয়ন। অবশ্য এইসব সংস্থা ও কর্মরত মানুষদের সিংহভাগই অনিবন্ধীকৃত হওয়ার কারণে সরকারি তথ্য—পরিসংখ্যানে সচরাচর এর প্রতিফলন ঘটে না। তা না হোক, এইসব সংস্থা ১,২৮,০০০ কোটি টাকার তাদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করেছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের একটি রিপোর্ট অনুসারে, ৬০০০-এর চেয়েও বেশি সংখ্যক বৈচিত্রময় ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের শিল্প-দ্রব্য ও পণ্য তৈরি করে থাকে এইসব সংস্থা এবং এই উৎপাদিত সম্ভারের মধ্যে যেমন থাকে সাবেকি ঘরানার বা ঐতিহ্যবাহী শিল্পদ্রব্য, অন্যদিকে তেমনি থাকে অত্যাধুনিক রুচি-পছন্দের জিনিসপত্রও। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, SME-জাত পণ্য-বৈচিত্রে ও উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ, প্রথম স্থানটিতে রয়েছে চীন।

যাই হোক, সাধারণভাবে দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ও বিশেষভাবে সামগ্রিক শিল্প-বলয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের এই ক্রমবর্ধমান ও সমৃদ্ধতর উপস্থিতির প্রেক্ষিতে, দেরিতে হলেও, কেন্দ্রীয় সরকার এই উপ-ক্ষেত্রটির যথাযথ সুরক্ষার জন্য নীতিগত ও আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০০৬ সালে প্রবর্তন করা হয়েছে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ-সংক্রান্ত 'মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬' নামক আইন। সারা দেশের অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-সমূহকে নানাদিকে উৎসাহিত করার জন্য বেশ কয়েক দফা ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের ঘোষণা রয়েছে এই আইনে, যেমন—তাদের প্রসার, ক্রমোন্নতি ও প্রতিযোগিতা-মানসিকতাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য বিশেষ সরকারি তহবিল-গঠন, সহজে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা, উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য বিপণনে সরকারি আনুকূল্য ইত্যাদি।

মোটামুটি এই আইনের পরিপূরক রূপে পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে 'ন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং কমপিটিটিভনেস প্রোগ্রাম' (NMCP), যেটি মূলত MSME-গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পসমূহের আধুনিকীকরণ, প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন বৃদ্ধি, এক কথায় সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট ১০ দফা লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে যার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে দুর্বলতর শিল্প-ইউনিটগুলির উদ্যোগ-ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা, এককথায় সেগুলির সামগ্রিক 'অন্ত্রপ্রেনরশিপ'-কে ঢেলে সাজিয়ে অনেক বেশি কার্যকরী, সু-সমন্বিত ও জোরদার করে তোলা। এরকম কয়েকটি দফা হল—উৎসাহমূলক নির্দেশনার (ইনক্যুবেটর) মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দুর্বল শিল্পের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত (অন্ত্রপ্রেনরিয়াল অ্যান্ড ম্যানেজেরিয়াল) উন্নয়নের জন্য সরাসরি সরকারি সহায়তা-দান, উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতামূলক গুণগত উৎকর্ষ-সাধনের জন্য আধুনিকতর উদ্যোগ-কুশলতার (QMS/QTT) প্রয়োগে শিল্প-ইউনিটগুলিকে সমর্থ করে তোলা, MSME-বিভাগে তথ্য ও সংযোগ-সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি।

কিছু নতুন সরকারি কর্মসূচি

শুধুমাত্র MSME-পর্যায়ের শিল্পের জন্যই নয়, সামগ্রিক উৎপাদন-শিল্পকে নতুন সরকারি নীতি-কর্মসূচি দ্বারা পুনর্বিন্যস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে 'জাতীয় উৎপাদন নীতি' ঘোষিত হয়েছিল। এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি ছিল মোটামুটি এইরকম: (১) এই ক্ষেত্রটির বার্ষিক বৃদ্ধির বর্তমান হারকে আগামী বছরগুলিতে বাড়িয়ে ১২-১৪ শতাংশ করা; (২) দেশের জিডিপি-তে উৎপাদন-শিল্পের ১৫-১৬ শতাংশ অনুপাতকে বাড়িয়ে ২০২২ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশে পৌঁছানোর চেষ্টা করা; (৩) ২০২২ সালের মধ্যে এই শিল্পক্ষেত্রে আরও ১০ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

হালফিলের জাতীয় উৎপাদন-নীতির একটি নতুন সংযোজন হল 'নীতিমূলক-হস্তক্ষেপ'। এই 'হস্তক্ষেপ-নীতি'-র মূল কথা হল—ধরাবাঁধা সরকারি নিয়ম-বিধি, আইন-কানুনে প্রয়োজনীয় নমনীয়তা-সঞ্চারণ। সংশ্লিষ্ট ঘোষণাতে এ-ও বলা হয়েছে, সাধারণভাবে সমগ্র উৎপাদনক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, পরিবেশ-সহায়ক আধুনিকীকরণ, দেশের যুব সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় দক্ষতা-উৎকর্ষে উৎসাহিত করে উন্নততর কর্মোপযোগী করে তোলা ইত্যাদি। এই পরিকল্পনার আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল—দেশ জুড়ে একটি 'জাতীয় বিনিয়োগ ও উৎপাদন-শিল্প অঞ্চল' (ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং জোনস্—NIMZ) গড়ে তোলা। এই NIMZ-এর উদ্যোগে দেশের অ-কৃষিযোগ্য ও পরিত্যক্ত জমিকে ব্যবহার করে উৎপাদন-শিল্প প্রসারের উপযোগী বিশ্বমানের শিল্প-তালুক তৈরি করা হবে। এই প্রকল্পের সু-সমন্বয়ের জন্য দেশ জুড়ে ১২টি NIMZ-অঞ্চল গড়ে তোলা হবে এবং এই সমগ্র প্রকল্পটি গড়ে উঠবে কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে।

এই নতুন উৎপাদন-শিল্প নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত দেখে নেওয়া যাক।

প্রায় সব সমালোচনার অভিমুখ আবর্তিত হয়েছে একটি মূল বিষয়কে ঘিরে। সেটি হল—আর পাঁচটা সরকারি প্রকল্প-প্রণয়নের মতোই এখানেও রয়েছে, ঘোষণা ও বাস্তবায়নের (যা আবার দীর্ঘমেয়াদি!) নানারকম অনিশ্চয়তা ও অসম্ভাব্যতা। জিডিপি-তে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের অনুপাত-বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা-বৃদ্ধি বা কর্মসংস্থান-বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এই ঘোষণায়, এমনকী NIMZ-এর যে সু-উচ্চমানের অতিব্যাপ্ত ও বহুমুখী পরিকল্পনা—বিভিন্ন সমালোচক ও সমীক্ষকের মতে, এককথায় এ সবকিছুই বহুলাংশেই অবাস্তব। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ সুনীল মানি মন্তব্য করেছেন, "... বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও যান্ত্রিক উচ্চাশা-পোষণ—এইসব কারণে, চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো কার্যত অসম্ভব।" ('ন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং পলিসি: মেকিং ইন্ডিয়া আ

পাওয়ারহাউস', ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি, ৩১.১২.২০১১)।

অন্যদিকে, বেশ কিছু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিকে সামনে রেখে নয়, বরং সাধারণভাবে ভারতের উৎপাদন-শিল্প ভবিষ্যতের ত্রুটি ও দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নিত করেছেন সমালোচনার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন খুব অল্পকথায় সহজভাবে ভারতে উৎপাদন-শিল্প প্রসারের পথে যে মূল প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি হল: বিদ্যুৎ-সড়ক-রেল-বন্দর ইত্যাদি পরিকাঠামোর দুর্বলতা; অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানের সাপেক্ষে ভারতের মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষা, দক্ষতা-অর্জন এবং পেশাগত প্রশিক্ষণমূলক প্রয়োজনীয় শিক্ষা ইত্যাদি প্রসারের হতাশাব্যঞ্জক নীচু-হার।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' ও উৎপাদন-শিল্প

লোকসভায় সদ্য-ঘোষিত বাজেট প্রস্তাবে (২০১৫-১৬) কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে, প্রায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, বর্ধিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে উৎপাদন-শিল্পক্ষেত্রকে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র পরিসরে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি-সহ উৎপাদন-শিল্পকে যেন রাখা হয়েছে কেন্দ্রস্থলে। অর্থমন্ত্রীর ভাষণে 'ম্যানুফ্যাকচারিং' (উৎপাদন) শব্দটি শোনা গেছে ১৫ বার এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র উল্লেখ হয়েছে দশ বার। যাইহোক, বর্তমান বাজেট-প্রস্তাবে বারবার উচ্চারিত অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্ববাহী এই উৎপাদন-শিল্পের জন্য ঠিক কী ধরনের প্রস্তাব রয়েছে, সেগুলির দিকে এক ঝলক তাকানো যেতে পারে:

(১) এই শিল্পক্ষেত্রে আধুনিক উদ্ভাবনী-প্রযুক্তির স্বচ্ছন্দ ও সুবিধাজনক সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট রয়্যালটি, ফি ইত্যাদির উপর আয়করের হার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ১০ শতাংশ।

(২) উৎপাদন-এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ কয়েকটি উপকরণ, কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ—ইত্যাদির উপর আমদানি-কর কমানো হয়েছে।

(৩) 'জাতীয় দক্ষতা মিশন' গড়ে তোলা, যার সুফল উৎপাদনক্ষেত্র থেকে উৎসারিত হয়ে আরও কয়েকটি মন্ত্রকে প্রসারিত হতে পারে।

(৪) দেশীয় উৎপাদন-শিল্পকে সহায়তা দানের জন্য সৌরশক্তির ওয়াটার হিটার, ট্যাবলেট কম্পিউটর, চর্মজাত জুতা ইত্যাদির উপর উৎপাদন-শুল্ক হ্রাস করা।

(৫) দেশের গ্রামীণ যুবসম্প্রদায়কে উৎপাদন-শিল্পের উপযোগী দক্ষকর্মী হিসাবে গড়ে তুলে অধিকতর কর্মসংস্থানের জন্য 'দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা'র আওতায় ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

(৬) উৎপাদন-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত দেশের ছোটখাট উদ্যোগপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়ার অসুবিধা ও মূলধন-সংকট লাঘব করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের ব্যাংক 'মাইক্রো ইউনিটস্ ডেভেলপমেন্ট রিফাইন্যান্স এজেন্সি' (MUDRA) ব্যাংক গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে ২০,০০০ কোটি টাকার তহবিল, ৩০০০ কোটি টাকার ক্রেডিট-গ্যারান্টি, তৎসহ উপভোক্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুবিধাজনক কর-পর্যায়ের ব্যবস্থা থাকবে।

এইসব বাজেট-প্রস্তাব ছাড়াও উৎপাদনক্ষেত্রের অনুকূলে, কিছুটা প্রত্যক্ষ এবং কিছুটা পরোক্ষভাবে, আরও একটি উৎসাহজনক প্রস্তাব রয়েছে এবারের বাজেটে। তা হল—প্রতিরক্ষাখাতে গত বছরের বরাদ্দ ২,২২,৩৭০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ২,৪৬,৭২৭ কোটি টাকা করা। এই খাতের বর্ধিত বরাদ্দের ফলে কিছুটা হলেও সুফল পাবে উৎপাদন-শিল্প, কারণ প্রতিরক্ষা উপকরণের অনেক ছোট-বড় আইটেমের উৎপাদন ও সরবরাহ করে থাকে দেশের উৎপাদনক্ষেত্রই।

পরিশিষ্ট

ভারতের উৎপাদন-শিল্প নিয়ে সরকারের পরিমার্জিত নীতি বা বাজেটে এই ক্ষেত্রটির ক্রমোন্নতির জন্য বহুমুখী প্রকল্প-প্রস্তাব অথবা অর্থনীতিবিদ-বিশেষজ্ঞদের নানাবিধ উদ্বেগ-সমালোচনা—এসবের মূলে কিন্তু রয়েছে একই বা অভিন্ন কারণ। তা হল—ভারতীয় অর্থনীতিতে এই ক্ষেত্রটির অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। আবার একথাও সত্য যে, বিগত কয়েক বছর ধরে এদেশের কৃষিক্ষেত্র, খনিশিল্প বা আরও দু-একটি ক্ষেত্রের বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ইত্যাদির তুলনায় উৎপাদনক্ষেত্রের সামগ্রিক অবস্থা হয়তো 'ততটা খারাপ' নয়, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত বা উন্নতিশীল দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এই ক্ষেত্রটি অনেকটাই পিছনে পড়ে রয়েছে। তাই এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত—দ্রুততম বৃদ্ধির অন্যতম দেশের স্বীকৃতি ভারতের তরফে অক্ষত রাখতে হলে উৎপাদনক্ষেত্রের দ্রুত সমৃদ্ধি একান্তভাবে প্রয়োজন। চীন এবং 'এশীয় ব্যাঘ্র' গোষ্ঠীর (দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ান) দেশগুলিতে যে বিস্ময়কর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছে, তার মূল চালিকাশক্তি বা স্তম্ভ উৎপাদন-শিল্প।

ভারতের জিডিপি-তে উৎপাদনক্ষেত্রের অনুপাত সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে যেখানে ১৫-১৬ শতাংশে আটকে রয়েছে, চীনের জিডিপি-তে এই অনুপাত ৪২ শতাংশ। অথচ ভারতের উৎপাদনক্ষেত্রের আয়তন চীনের ১৩ শতাংশ। তাই, এই ক্ষেত্রটিতে এশীয় তথা আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি ভারতকে পৌঁছতে হলে পাড়ি দিতে হবে অনেকটাই পথ। তবে লক্ষ্য যদি অবিচল থাকে এবং নীতি-কর্মসূচি রূপায়ণে যদি থাকে সামগ্রিক দায়বদ্ধতা ও আন্তরিকতা, তাহলে আপাত-অসম্ভবকেও বহুলাংশেই সম্ভব করে তোলা যায়। এই ভারতই তো সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে তথ্য-প্রযুক্তি তথা পরিষেবা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্ব ও দ্রুততর হারের জিডিপি বৃদ্ধির দেশের স্বীকৃতি অর্জন করে তা প্রমাণ করেছে। তাই, ভারতের উৎপাদন-শিল্প ক্ষেত্রেরও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ আশা করাই যেতে পারে। ❑

[লেখক অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ের প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার]

সহায়ক গ্রন্থ :

- ☐ 'ইন্ডিয়া ২০১৪'—প্রকাশনা বিভাগ, ভারত সরকার
- ☐ 'ইন্ডিয়ান ইকোনমি'—মিশ্র ও পুরী
- ☐ 'পলিসিস, ইনস্টিটিউশনস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট'—জন ডেগজবোল-মার্টিনুসেন

অশোধিত তেলের মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে

জ্বালানি তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী হলেই সাধারণ মানুষের পকেটে নানাভাবে টান পড়ে। কারণ, তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনীতির সর্বস্তরকেই প্রভাবিত করে এবং মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। অশোধিত তেলের বাজারদর কীভাবে নির্ধারণ করা হয়, আলোকপাত করছেন **হিরণ্ময় রায়, অনিল কুমার ও বিজয় শেখাওয়াত।**

১৯৭০-এর দশকের শেষ এবং ১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকের ঘটনা। তেলের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় পাশ্চাত্য দেশগুলি আরও বেশি করে তেল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা প্রযুক্তিগতভাবে বেশ কঠিন এবং বাণিজ্যিক দিক থেকে অলাভজনক, এ ধরনের সহায়সম্পদ ও তৈলখনিগুলির উন্নয়নের সম্ভাবনার দিকে বিশেষ নজর দিতে শুরু করে। ১৯৭০-এর দশকের শেষ ভাগে আলাস্কা এবং উত্তর সাগরের দেশগুলির হঠাৎ করে তেলের বাজারে আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর ফলে তেলের চাহিদা যেমন বিশ্ববাজারে বৃদ্ধি পেতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি তেলের জোগানও বাড়তে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ার প্রবণতা কমতে থাকে এবং এই পরিস্থিতি চলতে থাকে সহস্রাব্দের শেষ পর্যন্ত।

এরই মধ্যে ১৯৭৩ সালে তেলের দাম যখন বাড়তে শুরু করে তেল ও পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলির সংগঠন OPEC বাজার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাতে প্রকাশ পায় যে লক্ষ লক্ষ বা তারও বেশি ব্যারেল উদ্বৃত্ত তেল উৎপাদনের ক্ষমতা OPEC-এর রয়েছে। হঠাৎ করে চাহিদার মোকাবিলা করার মতো পরিস্থিতি বা চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার মতো দক্ষতা যে, ওই সংগঠনের রয়েছে তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ সালে তেলের মূল্যবৃদ্ধির শুরু থেকে ১৯৮০-র দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিশ্বে তেলের অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল OPEC-এর অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার কাছাকাছি। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও রাশিয়ার মতো OPEC বহির্ভূত দেশগুলি মূল্য পরিস্থিতির তোয়াক্কা না করে তাদের মজুত তেল ভাণ্ডার উজাড় করে দিতে শুরু করে।

অতিরিক্ত তেল উৎপাদন ক্ষমতার বেশির ভাগটাই ছিল সৌদি আরবের। মূল্যস্তর ধরে রাখতে ১৯৭০-এর দশকের শেষাশেষি সৌদি আরব তেল রপ্তানির পরিমাণে বড় ধরনের কাটছাঁট করতে শুরু করে। দক্ষতার সঙ্গে তেলের বাজার কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে OPEC ও সৌদি আরবের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। OPEC নির্দিষ্ট কোটার চুক্তির ভিত্তিতে তেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত দেয়। ওই চুক্তির ভিত্তিতেই তেলের উৎপাদন বাড়ানো বা কমানোর সপক্ষেও সওয়াল করে তারা। অন্যদিকে সৌদি আরব এই মতের বিরোধিতা করে জানায় তারা তেলের জোগান নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে। বরং মূল্যস্তর ধরে রাখতেই তারা বেশি আগ্রহী। অর্থাৎ সৌদি আরবের মতে আন্তর্জাতিক বাজারে উপযুক্ত মূল্যেই তারা তেলের সরবরাহ করে যেতে আগ্রহী এবং মূল্য অনুযায়ী চাহিদার ফারাকের কথা মাথায় রেখেই তারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়। সৌদি আরব তাই ১৯৭০-এর দশকের শেষে তাদের উৎপাদন ১০ মিলিয়ন ব্যারেল থেকে কমিয়ে ১৯৮৫ সালে ৩ মিলিয়ন ব্যারেলে নামিয়ে আনে।

একটি বিষয় পরিষ্কার যে তেলের মূল্যহ্রাসেরও একটা নির্দিষ্ট সীমা বা মাত্রা রয়েছে যার পরে তেলের উৎপাদন নিম্নমুখী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যে সমস্ত তৈলক্ষেত্রের উৎপাদন বেশ ব্যয়সাপেক্ষ এবং যে সমস্ত ক্ষেত্র বা খনি থেকে সরবরাহের গন্তব্য অনেক দূরে সেই সমস্ত স্থানে এই নির্দিষ্ট সীমা বা মাত্রা ছাড়ালেই উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। এই ধরনের পরিস্থিতির যখন উদ্ভব হয় মূল্যসংক্রান্ত পরিসংখ্যান তখন বিপরীতমুখী হয়ে পড়ে এবং বাজারের ওপর চাপও কমতে থাকে। এই কারণেই বিশেষজ্ঞদের মতে সৌদি আরবের লক্ষ্য তেলের মূল্যস্তর ধরে রেখে সরবরাহ সীমিত রাখা যাতে বাজারে উদ্বেগ বা আশঙ্কা হ্রাস করা যায় এবং পাশ্চাত্যের জ্বালানি সংস্থাগুলিও সংকটের মুখোমুখি না হয়।

আজকের পরিস্থিতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অতিরিক্ত তেল উৎপাদনের ক্ষমতা এখন সৌদি আরবের নেই, তাই বাজারে আরও বেশি করে তেলের জোগান দেওয়ার মতো অবস্থাতেও তারা নেই। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সৌদি আরবের তেল উৎপাদন তাদের সর্বোচ্চ উৎপাদন মাত্রারই হয় সমতুল বা প্রায় কাছাকাছি। ১৯৯০-এর পর থেকে তেলের বিশ্ববাজার এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে তেলের কোটাকে কেন্দ্র করে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বহুবছর ধরে চলতে থাকা বিবাদ বিসংবাদের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে OPEC যখন তেলের উৎপাদনের ব্যাপারে তার নিয়ন্ত্রণ ও কার্যক্ষমতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে তখন তেলের বিশ্ববাজার এক নতুন পরিস্থিতির

মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ ব্যাপক কোটা কাটছাঁটের বিষয়টিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির অনুমোদন পাওয়া যে বেশ কঠিন—এই বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তেলের জোগান তথা সরবরাহের ক্ষেত্রে OPEC এখন ন্যূনতম মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে পারে মাত্র।

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে বৃহদাকারের অর্থনৈতিক ধাক্কা তেলের প্রকৃত মূল্যস্তরকে বাড়িয়ে তুলেছিল সেটাও যেমন সত্য, ঠিক একইভাবে ২০০০-এর দশকের প্রথম দিকে আর্থিক টানাপোড়েনও তেলের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ওই দশকের মাঝামাঝি এর প্রভাব আরও বেশি করে নজরে এসেছিল। ২০০৪ থেকে ২০১০ পর্যন্ত তেলের ৬৫ শতাংশ প্রকৃত মূল্যবৃদ্ধির পেছনে ৪৪ শতাংশ অবদানই ছিল এই আর্থিক ধাক্কা বা টানাপোড়েনের। তেলের মূল্যবৃদ্ধির পেছনে তৃতীয় ধাক্কাটি আসে বৃহদাকারের আর্থিক সংকট থেকে। ২০০৭-২০০৮-এর তেলের মূল্যবৃদ্ধিজনিত ধাক্কাটির মূলে ছিল বৃহৎ অর্থনৈতিক সংকট তথা বিপর্যয়। তেলের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদার বিষয়টি যেমন অবশ্যই ধর্তব্য বা বিবেচনার মধ্যে পড়ে, তেমনই অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কাটির ভূমিকা বোধহয় আরও অনেক বেশি।

২০০৩ সাল থেকে তেলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তেলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে সামুদ্রিক জীবাশ্ম থেকে আহরিত তেল ও গ্যাস, টার স্যান্ড (বালি) এবং অন্যান্য ধরনের ঘন তেল উৎপাদনের বিষয়টি বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। এর কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই ধরনের তেল আহরণকে এক প্রকার অসম্ভব বলেই মনে করা হত। ভাবা হত এই ধরনের উৎপাদন বোধ হয় ব্যয়সাশ্রয়ী হবে না। অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ছাড়াও নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ভূ-গর্ভস্থ শিলার ভেতর থেকে তেল আহরণের বিষয়টিকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে। এর ফলে নতুন এই সহায়সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেল উৎপাদকের প্রবণতাও বিপরীতমুখী হয়ে ওঠে। ১৯৭০-এর দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তেল উৎপাদন ক্রমাগত কমতে শুরু করে এবং ২০০৮ সাল নাগাদ তা দিনে মাত্র ৫ মিলিয়ন ব্যারেলে নেমে যায়। বর্তমানে ওই দেশে প্রতিদিন উৎপাদিত হয় ৮.৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল। বিশেষজ্ঞদের অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে দেখা যাবে ২০১৬ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন তেল উৎপাদন মাত্রা ৯.৫ মিলিয়ন ব্যারেল অতিক্রম করে যাবে। এর মধ্যে অতিরিক্ত উৎপাদকে অধিকাংশই আসবে অ-চিরাচরিত উৎস থেকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি, তেলের বাজারে ইরাকের প্রত্যাবর্তন এবং অ্যাঙ্গোলার মতো আফ্রিকার অন্যান্য কয়েকটি দেশ তেল উৎপাদনের মানচিত্রে চলে আসায় বিশ্বে তেল উৎপাদনের রেখাচিত্রটির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে রাশিয়ার নামও যেখানে বর্তমানে তেলের উৎপাদন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ কয়েক বছরের উৎপাদনের প্রায় কাছাকাছি বলা চলে।

বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যাঁরা সমগ্র বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন তাঁরা এই বিষয়টি খেয়াল করেন না যে তেলের মূল্য স্থির করার পেছনে অনেক জটিল অঙ্ক ও মাপকাঠি কাজ করে। হিসেবের একটু এদিক-ওদিক হলেই হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। মূল্য স্থির করার ক্ষেত্রে এই হিসেবনিকেশ বা মাপকাঠির সর্বদাই একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। তেলের দাম নাটকীয়ভাবে বাড়াকমার কারণে এই হিসেবনিকেশ বা অঙ্ক বাজারে কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে আসারও ক্ষমতা রাখে।

ঘন বা ভারী তেল উত্তোলনের বিষয়টি একদিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৌদি আরবে এক ব্যারেল তেল আহরণ বা উত্তোলনে ব্যয় হয় ৩ ডলারের মতো। কিন্তু অ-চিরাচরিত উৎস থেকে তেল আহরণের ব্যয় কিন্তু অনেকগুণ বেশি। কারণ এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণের সমগ্র বিষয়টিতে সহায়সম্পদ ও জ্বালানির জন্যই অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই তেলের দাম হঠাৎ করে বেশ কিছুটা কমে গেলে বাজারে এই ধরনের অচিরাচরিত উৎস থেকে তেলের জোগানও কমতে বাধ্য। এই ফলে বেশ কিছু জ্বালানি সংস্থার অস্তিত্বও প্রায় বিপন্ন হয়ে পড়ে। কারণ ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার মূল্যের ভিত্তিতে মূলত ঋণ নির্ভর হয়ে এই সমস্ত সংস্থাকে তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করতে হয়।

জ্বালানি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা সংস্থা ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড কোম্পানির মতে যুক্তরাষ্ট্রে সামুদ্রিক জীবাশ্ম থেকে তেল উৎপাদক অধিকাংশ সংস্থাই তাদের মুনাফার বিষয়টিকে ধরে রাখতে ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলার মূল্য নির্ধারণের পক্ষে। জ্বালানি শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুযায়ী ব্যারেল প্রতি তেলের দাম ৮৫ ডলারের নীচে নেমে গেলে কম উৎপাদন হয়, এ ধরনের তৈলকূপ বন্ধ করে দেওয়া ছাড়াও উৎপাদনখাতে বিনিয়োগ করাও স্থগিত রাখতে হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের আগেও সংকটে পড়তে হয় কানাডার ঘন তথা ভারী তেল শিল্পকে। শুধুমাত্র মাত্রাছাড়া উৎপাদন খরচই নয়, কানাডার সমস্যা হল ওই দেশের তেল উৎপাদন সংক্রান্ত অন্যান্য খরচখরচাও মাত্রাতিরিক্ত। আরব উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে তেল পরিবহণের খরচ যেখানে ব্যারেল প্রতি ৩ ডলারের মতো, পশ্চিম কানাডা থেকে তেল পরিবহণখাতে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ব্যারেল প্রতি ১২ থেকে ১৫ ডলারের মতো।

কানাডায় এই তেল উৎপাদন পরিস্থিতির কারণ ওই দেশে তেল উৎপাদিত হয় উপকূল এবং রপ্তানি কেন্দ্র থেকে বহু দূরে মূল ভূখণ্ডে। দ্বিতীয় কারণটি হল কানাডায় আলকাতরার মতো ঘন পদার্থ ও অ্যাসফাল্ট থেকে যে তেল আহরণ করা হয় তা খুবই ভারী ও ঘন ধরনের। ফলে মেক্সিকো উপসাগর বা মার্কিন পূর্ব উপকূল বরাবর বিস্তৃত হাজার হাজার মাইল পাইপ লাইনের মাধ্যমে শক্তিশালী পাম্প ব্যবস্থায় তা সরবরাহ করতে হয়। শুধু তাই নয়, এই তেল যেহেতু অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের তাই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তা বিক্রি করতে হয়। বিশেষ করে তেলের বাজার যখন নিম্নমুখী এবং জোগান যখন ঊর্ধ্বমুখী তখন এই তেল

অনেক অনেক কম দামে বাজারে ছাড়তে হয়।

২০০৩-২০০৮ এবং ২০১০-২০১১ এই দুটি সময়কালে তেলের দাম নজিরবিহীন ভাবে বেড়ে যাওয়ায় তেলের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে ভালো রকমের বিতর্ক দানা বাঁধে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে করা হয় ওই সময়কালে তেলের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টিতে অর্থনীতির খুঁটিনাটি দিয়ে বিচার বা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বরং তেলের আগাম বাজারের আর্থিকীকরণ-কে এজন্য দায়ী করা যেতে পারে। তেলের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নানারকম আগাম অনুমান বা জল্পনাকল্পনা একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে বলে মনে করা হয়। তেলের আগাম বাজারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তার রাজনীতিবিদদের তখন মাঠে নামতে হয়।

তত্ত্বের দিক থেকে আগাম বাজারে তেলের মূল্য তাৎক্ষণিক বাজারেও পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। কারণ তেলের প্রকৃত বেচাকেনা হয় এই তাৎক্ষণিক বাজারেই। কাফম্যান অ্যান্ড উলমান ২০০৯ সহ কয়েকটি সমীক্ষায় প্রকাশ বেশ কয়েক বছর ধরে আগাম ও তাৎক্ষণিক বাজারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকা মূল্যের ঊর্ধ্বগতি জল্পনাকল্পনার বিষয়টিকে আরও বেশি করে উৎসাহ জুগিয়েছে। অন্যদিকে ২০১০-এর ত্রিউলজি, ডি' ইক্লেসিয়া ও বেঞ্চিভেঙ্গা পরিচালিত এক সমীক্ষায় আগাম অনুমান ও জল্পনা এবং ডলার ও ইউরোর হারের অত্যধিক ওঠানামার ফলে তেলের ক্রেতারা যে উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করে তাকেই সমর্থন জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে আরও দুটি স্বতন্ত্র সমীক্ষায় কাজ চালায় স্টিভানস্ ও সেশনস (২০০৮) এবং আচার্য ও অন্যান্যরা (২০০৯)। এই দুটি সমীক্ষা জানিয়েছে যে অশোধিত তেলের মজুত ভাণ্ডার এবং আগাম মূল্য নির্ধারণের মধ্যে একটি ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে যা তাৎক্ষণিক বাজারে তেলের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। এ ব্যাপারে ২০১১ সালে আর একটি সমীক্ষা চালায় ব্যুকসাহিন ও অন্যান্যরা।

তবে অধিকাংশ সমীক্ষাই আগাম জল্পনাকল্পনাকে তেলের মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ মানতে নারাজ। অলক্যুইস্ট ও জার্ভিস (২০১১) বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছে অন্যভাবে। তাদের মতে তেলের জোগানের সীমাবদ্ধতার ফলে এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যে বাস্তবিক কর্মকাণ্ড চলে তার সঙ্গে তেলের চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকার বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পর্কিত এবং তেলের দামের ক্ষেত্রে ওঠানামা তারও একটি অন্যতম কারণ। আবার, ২০১২ সালে লুৎজ কিলিয়ান, বাসাম ফাটুহ ও লবণ মহাদেব-এর মতো অর্থনীতিবিদরা সমীক্ষা চালিয়ে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে তেলের তাৎক্ষণিক ও আগাম মূল্য অর্থনীতির সাধারণ খুঁটিনাটি বিষয়গুলিই প্রতিফলিত করে। তাৎক্ষণিক এবং আগাম মূল্য নির্ধারণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তেলের বাজারদরের আগাম পূর্বাভাসের তুলনায় অর্থনীতির সাধারণ খুঁটিনাটি বিষয়গুলিই বেশি করে তুলে ধরে।

১৯৯৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে অশোধিত তেলের মূল্য পরিবর্তনের বিষয়টিকে চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য সংক্রান্ত খুঁটিনাটির নিরিখে ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। কারণ বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে তেলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে আরও অন্যান্য বিষয় যুক্ত। আজকের দিনে বিশ্লেষকরা মনে করেন না যে তেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য ফাটকাবাজি বা আগাম জল্পনাকল্পনাই দায়ী। তবে যারা এই সমস্ত ফাটকা কারবার বা আগাম জল্পনার সঙ্গে যুক্ত তারা সহজেই নগদ অর্থের জোগান দিতে পারে এবং এই কারণে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেকটাই ভূমিকা পালন করে থাকেন। তবে তেলের মূল্য নির্ধারণে ফাটকা কারবারিদের ভূমিকা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এ ব্যাপারে কোনওরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ চট করে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত তেলের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি চাহিদা ও জোগান সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যকারণের সঙ্গে যুক্ত।

ভারতে তেলের মূল্য সম্পর্কিত কাজকর্ম আন্তর্জাতিক মূল্যস্তর অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তৈলক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা মূলক কাজকর্মের দিকে লক্ষ রেখেই ভারতে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তবে আমাদের দেশে তেলের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তেলের জোগানের বিষয়টি সমধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তেল সরবরাহকারী কোনও সংস্থা কোনও কারণে ব্যর্থ হলে আমাদের বিকল্প কোনও সরবরাহের পথ খুঁজে বের করতে হয়। একই সঙ্গে সরকারি নীতি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক সম্পর্কের মতো বিষয়গুলিও এদেশে তেলের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিককালে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক তেল সংক্রান্ত বিষয়ে যে কূটনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তা থেকে প্রকাশ আগাম পূর্বাভাস তথা ফাটকা ব্যবসার প্রবণতা ভারতীয় তেলের বাজারে মূল্য স্থির করার বিষয়টিকে নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এই কারণে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৫ থেকে অনেকের প্রত্যাশা তেলের মূল্য নির্ধারণে সরকার দীর্ঘমেয়াদি নীতি গ্রহণ করবে। ভারতীয় অর্থনীতির সার্বিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ রেখেই সরকার এই নীতি গ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ দেশের বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন তেলের নিরন্তর জোগান। অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়ায় তেল যে একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

এই নিবন্ধের আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার যে আলোচ্য সময়কালে তেলের বাজার যতটা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত বলে মনে করা হয় তা কিন্তু বাস্তবে ততটা নয়। বরং মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত আগাম পূর্বাভাস তেল নিয়ে যথেচ্ছ ব্যবসা এবং তেলের মূল্য পরিস্থিতি দিন দিন ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার কারণে বাজার বরং অনেকটাই ফাটকা নির্ভর। তেলের মূল্য নির্ধারণের পেছনে যে সমস্ত কারণগুলি বিশেষভাবে কাজ করে থাকে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা সৃষ্টিরও চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। ❑

আইনি সহায়তা এবং আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

ন্যায়বিচার—যেকোনও মানুষের সবচেয়ে বড় মৌলিক অধিকার। কিন্তু যেসব মানুষ বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে শুধুমাত্র দারিদ্রের কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পান না তা'দের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। শুধু দেশের সংবিধান নয় বরং সুপ্রিমকোর্টের বিভিন্ন রায়ে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রকে এই কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই কর্তব্য পালনের অঙ্গ হিসাবে দরিদ্র জনসাধারণের কাছে নিখরচায় আইনি পরিষেবা পৌঁছে দিতেই জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বা নালসার গঠন। এই সংস্থার গঠন ও বহুবিধ কর্মধারা নিয়ে লিখেছেন **মনোজ কুমার সিন্‌হা।**

যেকোনও সভ্য সমাজেই নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম হল ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার না পেলে অন্য মানবাধিকারগুলিও অর্জন করা যায় না। আন্তর্জাতিক স্তরে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের ১৪(৩)(ডি) অনুচ্ছেদে একজন ব্যক্তিকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা হল এই রকম—

> নিজের উপস্থিতিতে বিচার পাওয়া এবং নিজে বা নিজের পছন্দমতো আইনি সহায়তার মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার এবং এই অধিকার প্রয়োগের জন্য তার যদি কোনও আইনি সহায়তা না থাকে সে বিষয়ে অবগত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যয়ভার বহনের কোনও সামর্থ্য না থাকলে প্রয়োজনে ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিনাখরচে আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার—

যেকোনও ফৌজদারি মামলার চূড়ান্ত রায় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের ১৪(৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত এই আইনি সহায়তার পাওয়ার অধিকার সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা পাওয়ার এই অধিকারের ভিত্তিই হল সাম্য। তবে শুধুমাত্র ফৌজদারি মামলার বিচারের ক্ষেত্রেই এই অধিকার সীমাবদ্ধ।

ভারতীয় সংবিধানে সরাসরিভাবে বিনামূল্যে আইন সহায়তা পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া না হলে, 'রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি'র আওতায় ৩৯এ অনুচ্ছেদে দরিদ্র ব্যক্তিরা যেখানে জড়িত সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। সংবিধানের ৩৯(এ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে—

> আইনি ব্যবস্থাপনার পরিচালনায় সমান সুযোগের ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্র সুনিশ্চিত করবে এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক বা অন্য অক্ষমতার কারণে কোনও নাগরিক যাতে ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন উপযুক্ত আইন বা কর্মসূচি বা অন্যান্য উপায়ে রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে।[১]

সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী দরিদ্র ও অভাবী নাগরিকদের আইনি সহায়তাদান আদতে সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত স্বাধীনতারই অঙ্গ। এম এইচ হোসকট বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায়[২] সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে মত প্রকাশ করে যে নাগরিকদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তাদানের বিষয়টি ২১নং অনুচ্ছেদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং তা যথার্থ, নিরপেক্ষ এবং ন্যায্য বিচার প্রক্রিয়ার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

এইক্ষেত্রে জে. কৃষ্ণ আইয়ারের মত হল—কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিরা আক্ষরিক অর্থেই আইনি সহায়তার অভাবে উচ্চতর আদালতে আবেদনের সাংবিধানিক এবং বিধিবদ্ধ অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন না, পূর্ণ ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই ধরনের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য কৌঁসুলি নিয়োগ করার বিধান সংবিধানের ২১ এবং ৩৯এ অনুচ্ছেদে বিশদে বিবৃত ১৪নং অনুচ্ছেদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।[৩]

এ প্রসঙ্গে অন্য একটি মামলার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্ষত্রী বনাম বিহার রাজ্য মামলায়[৪] সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত, নিরপেক্ষ এবং ন্যায্য বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে বিনামূল্যের আইনি সহায়তা পরিষেবা অত্যন্ত জরুরি এবং এই অধিকারের বিষয় সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে। এই আর্থিক বা প্রশাসনিক অক্ষমতার দোহাই দিয়ে কোনও দরিদ্র অভিযুক্তকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়ার সাংবিধানিক দায়িত্ব কোনও রাজ্য সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। দারিদ্রের কারণে কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে আইনি পরিষেবার সুযোগ নিতে না পারলে তাকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়া রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য যা যা করণীয় রাষ্ট্রকে তা করতে হবে।[৫]

আবার শীলা বারসে বনাম ভারত সরকার[৬] মামলাতেও সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়ার সাংবিধানিক দায়িত্বের মূল উৎস হল ১৪, ২১ এবং ৩১এ-অনুচ্ছেদ। এই মামলাতেও কিছু আইনজীবীর মনোভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে ভগবতী জে, দুস্থ মানুষজনকে সহায়তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আইনজীবীদের।

তিনি বলেছেন—জনসমাজের যে অংশ দরিদ্র, নিরক্ষর এবং অজ্ঞ তাদের কাছে অবশ্যই আইনজীবীদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে; যেকোনও সংকটের মুহূর্ত যেমন অপরাধে অভিযুক্ত, গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ হওয়ার সময় কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে সে সম্বন্ধে যারা কিছুই জানে

না তাদের সাহায্যেও এগিয়ে আসতে হবে আইনজীবীদের। বিপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য করার পরিবর্তে আইনজীবীরা যদি তাদের দুরবস্থার সুযোগ নিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলে সামগ্রিকভাবে আইনজীবীদের পেশা কালিমালিপ্ত হবে এবং দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ আইনজীবীদের ওপর থেকেই ভরসা হারাবেন। তাতে দেশের গণতন্ত্র ও আইনের অনুশাসন বিপন্ন হবে।[৭]

সুখদাস বনাম অরুণাচলপ্রদেশ মামলায়[৮] সুপ্রিম কোর্ট আরও একধাপ এগিয়ে বিনামূল্যে আইনি সহায়তাদানের সাংবিধানিক দায়িত্বের কথা রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিষয়টিকে একটি যুক্তিসংগত ও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুপ্রিমকোর্টের বক্তব্য অনুযায়ী, একজন দরিদ্র ব্যক্তি যদি আইনি সহায়তার দাবি নাও জানান তাহলে এই সহায়তা পাওয়ার অধিকার তাঁর থাকে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি আইনি সহায়তা নাও চান তাহলেও তাকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দিতে হবে। এই আইনি সহায়তা দেওয়া না গেলে বিচার প্রক্রিয়ার মর্যাদাহানি হবে।

অর্থনৈতিক অপরাধ বা গণিকাবৃত্তি বা শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধে যুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা না দেওয়ার যে যুক্তি দেখানো হয়েছিল তাও নাকচ করে দিয়েছে আদালত। আদালতের মতে, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগে প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দোষ এই যুক্তিই যদি মেনে চলতে হয় তাহলে এই যুক্তি সমস্ত অভিযুক্তের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তিদেরও বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার থাকবে।[৯] এখন এটা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত যে ভারতীয় সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মানবাধিকারগুলি সুনিশ্চিত করার জন্য অভিযুক্তদের আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার দেওয়ার পাশাপাশি বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা অতি আবশ্যক।[১০]

আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন

সংবিধানের ৩৯এ অনুচ্ছেদের বিধান মেনে প্রণীত হয়েছে 'আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৭'। দেশজুড়ে আইনি সহায়তাদানের কর্মসূচিকে একটি আইনগত ভিত্তি দেওয়ার জন্যই এই আইনটির অবতারণা। অবশেষে ১৯৯৫ সালে ৯ নভেম্বর থেকে কার্যকর হয় এই আইন। ওই বছরেরই ৫ ডিসেম্বর একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা রূপে গঠিত জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি—NALSA বা নালসা)। সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুযায়ী আইনি পরিষেবা দান সংক্রান্ত নীতি নির্দেশিকা তৈরি এবং আইনি পরিষেবার জন্য সবচেয়ে সুলভ ও ব্যয়সাশ্রয়ী কর্মসূচির রূপরেখা তৈরিই নালসার দায়িত্ব। এই আইনে জাতীয় রাজ্য, জেলা ও তালুক স্তরে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ গঠনের সংস্থান রয়েছে। উক্ত আইনের ৩(২)(এ) ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতের প্রধান বিচারপতি নালসা-র প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্টের কোনও কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নালসা-র কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান রূপে মনোনীত হবেন।[১১] নালসা-র বিভিন্ন নীতি ও নির্দেশাবলি কার্যকর করা, তথা জনসাধারণকে আইনি সহায়তা প্রদান ও লোক আদালত পরিচালনার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে।[১২] রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের শীর্ষে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট রাজ্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যিনি এই সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষকও বটে।[১৩] সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের কোনও কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এই কর্তৃপক্ষের কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত হন। জেলাস্তরে আইনি সহায়তাদানের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রতিটি জেলায় গঠিত হয়েছে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ।[১৪] সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা জজ পদাধিকারবলে এই এই জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান।[১৫]

তালুক স্তরে আইনি পরিষেবা মূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং লোক আদালত পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বা মণ্ডলে কিংবা কয়েকটি তালুক বা মণ্ডলকে নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীর জন্য তালুক আইনি পরিষেবা কমিটিও গঠিত হয়েছে।[১৬] সংশ্লিষ্ট তালুক আইনি পরিষেবা কমিটির এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় একজন বরিষ্ঠ দেওয়ানি জজ এই কমিটির শীর্ষে থাকেন এবং তিনি পদাধিকার বলে কমিটির চেয়ারম্যানও বটে।

সমাজের দুর্বলতর অংশকে বিনামূল্যে যথাযথ আইনি পরিষেবা দেওয়া এবং অর্থনৈতিক বা অন্য কোনও অক্ষমতার কারণে তারা যাতে আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন তা সুনিশ্চিত করাই এই আইনের মূল লক্ষ্য। এই আইনে ২(১)(সি) ধারা 'আইনি পরিষেবা'-র যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে যেকোনও আদালত বা কোনও কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইব্যুনালের সামনের কোনও মামলা বা আইনি প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে যেকোনও পরিষেবা দেওয়া তথা আইন সংক্রান্ত যেকোনও বিষয়ে পরামর্শদানের কথা রয়েছে। সমাজের দরিদ্র ও দুর্বলতর অংশকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দিতে নালসা দায়বদ্ধ। সেই সঙ্গে এই সংস্থা আইনি সহায়তাদান শিবিরের আয়োজনের পাশাপাশি লোক আদালতের মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তিতে উৎসাহ দিয়ে থাকে। এই আইন সমাজের দুর্বলতর অংশের প্রতি সামাজিক দায়িত্বের অঙ্গ হিসাবে তাদের হয়ে মামলা লড়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ওপর এবং সেইসঙ্গে সমাজকর্মীদের আইনসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ করে তোলার দায়িত্বও রয়েছে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ওপর। এই আইনে শিক্ষা শিবির (ক্লিনিক) গড়ে তোলার মাধ্যমে আইনি শিক্ষা কর্মসূচি প্রসারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়, আইন কলেজ এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে আইনি সহায়তা শিবির গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। আইনি সহায়তাদান কর্মসূচির প্রসার ঘটাতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ, রাজ্য কর্তৃপক্ষ এবং জেলা কর্তৃপক্ষ অন্যান্য সরকারি ও অসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করে চলেছে। ১৯৮৭ সালের আইনি সহায়তা কর্তৃপক্ষ আইনের ১২নং ধারায় আইনি সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই মাপকাঠি অনুযায়ী আবেদনকারীর যোগ্যতা এবং তাঁর সপক্ষে প্রাথমিকভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণের উপস্থিতি খতিয়ে দেখে রাষ্ট্রের খরচে তাঁর জন্য কৌঁসুলি নিয়োগ করে বিভিন্ন আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। সেইসঙ্গে এ বিষয়ে আদালতের যাবতীয় ফি এবং মামলা বিষয়ক অন্যান্য ব্যয়ও এই কর্তৃপক্ষ বহন করে থাকে। যে ব্যক্তিকে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ সহায়তা দিচ্ছে তাকে সংশ্লিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে কোনও রকম ব্যয় বহন করতে বলা হয় না। বিনামূল্যে যথাযথ আইনি পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে নালসা 'জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (বিনামূল্যের এবং যথাযথ আইনি পরিষেবা) বিধি, ২০১০' প্রণয়ন করেছে। বিশেষ বিশেষ মামলা যেখানে কোনও

ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়েছে সেখানে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ আইনজীবীদের নিয়মিত পারিশ্রমিক দিয়ে নিয়োগ করাই এই বিধির মূল কথা।

১৯৮৭ সালের আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন কার্যকর হওয়ার পর আইনি সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি এখন যথার্থ অর্থেই দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জন্মলগ্ন থেকেই 'নালসা' ১৯৮৭ সালের আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইনের লক্ষ্যগুলি পূরণের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আদালতের মামলার ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিবাদ নিরসনের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে দেশজুড়ে লোক আদালত পরিচালনার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে নালসা, সচেতনতা প্রসারের অঙ্গ হিসাবে নালসা দেশজুড়ে বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরের আলোচনাচক্র, কর্মশিবির এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। নিরক্ষরতার কারণে দেশের জনসংখ্যার যে বিপুল অংশ এখনও নিজের অধিকার সম্বন্ধেই সচেতন নন তাদের কাছে পৌঁছনোটাই এখন নালসার কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই সমস্ত মানুষের হাতের নাগালে আইনি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নালসাকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। আর নিকটবর্তী আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে শামিল করেই এই লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। এটাও মনে রাখতে হবে যে, যাদের ওপর প্রতিনিয়ত আইনের প্রভাব পড়বে তারাও কিন্তু আইনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সহজে তথ্য পান না।

পরিশেষে

স্বাভাবিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিবাদ নিরসনের বিকল্প এবং উন্নততর ব্যবস্থা হিসাবে লোক আদালতের ধারণাকে এক স্থায়ী আইনগত ভিত্তি দিয়েছে এই আইন। সরকারি অর্থে দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষজনকে আইনি সহায়তাদানের মাধ্যমে তাদের ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়াটা যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সে বিষয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলি এক মত। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়া দরিদ্র ব্যক্তিদের অধিকার প্রয়োগের প্রশ্ন তখনই আসবে যখন তিনি রাষ্ট্রের তরফে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাবেন।

তা না হলে তাদের এই অধিকার শুধু খাতায় কলমেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। অর্থাৎ তাঁদের এই অধিকার রক্ষায় আইনি সহায়তাদানের জন্য সরকারকে পর্যাপ্ত তহবিলের সংস্থান রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে ২০১২ সালে 'ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় আইনি সহায়তার সুযোগ বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের নীতি এবং নির্দেশিকা সমূহ' গ্রহণ করে রাষ্ট্রসংঘ। এই নীতি ও নির্দেশিকা অনুযায়ী, যথার্থভাবে কার্যকর আইনি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনমতো একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেবে। আইনি সহায়তা প্রদানের বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত এটিই প্রথম দলিল। ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম মৌলিক শর্ত হল আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের ২১নং ধারাকে ইতিমধ্যেই অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এরই আওতায় মৌলিক মানবাধিকারগুলির সমস্ত দিক চলে আসে। ভারতের বিচার ব্যবস্থা দরিদ্র ও নিপীড়িত জনসাধারণের কাছে আইনের সুবিধা পৌঁছে দিতে নিরলস প্রচেষ্টা জারি রেখেছে। ❑

[লেখক পশ্চিমবঙ্গ বিচারিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক ও নয়া দিল্লীর ইন্ডিয়ান ল' ইনস্টিটিউট-এর ডাইরেক্টর]

সহায়ক সূত্র :

১ ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির আওতায় ৩৯(এ) অনুচ্ছেদে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদানের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২ এম এইচ হোসকট বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, এআইআর, ১৯৭৮, এসসি ১৫৪৮

৩ এলবিআইডি, পি, ১৫৫৬

৪ ক্ষত্রী বনাম বিহার রাজ্য, এআইআর ১৯৮১, এসসি ৯২৮

৫ এলবিআইডি, পি-৯২৮

৬ শীলা বারসে বনাম ভারত সরকার, এআইআর, ১৯৮৩, এসসি, ৩৭৮, পুলিশি হেফাজতে মহিলা বন্দিদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন জানানো হয়। আবেদনকারী তাঁর চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে তিনি বম্বে সেন্ট্রাল জেলে পনেরোজন মহিলাবন্দির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাদের মধ্যে পাঁচজনই লক-আপে পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন।

৭ এলবিআইডি, পি-৩৮০ অনুচ্ছেদ ২

৮ (১৯৮৬) ২, এসসিসি, ৪০১

৯ ১৯৮৭ সালের আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইনের ১২নং ধারা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সীমার কম আয়সম্পন্ন মানুষ (আয়ের এই সীমা রাজ্যভেদে আলাদা হয়), মহিলা ও শিশুদের পাশাপাশি যেকোনও আয়ের তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি আইনি সহায়তা পাওয়ার যোগ্য—
এছাড়া যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়া যেতে পারে সেগুলি হল—
(ক) মানব পাচার চক্রের শিকার হওয়া কোনও ব্যক্তি বা সংবিধানের ২৩নং ধারা অনুযায়ী কোনও 'ভিক্ষাজীবী'
(খ) মানসিকভাবে অসুস্থ বা অন্য কোনও রকমভাবে অক্ষম ব্যক্তি
(গ) গণবিপর্যয়, জাতিদাঙ্গা, জাতপাতের সংঘর্ষ, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প বা শিল্প দুর্ঘটনার শিকার কোনও ব্যক্তি
(ঘ) কোনও শিল্প শ্রমিক এবং
(ঙ) হেফাজতে থাকা কোনও ব্যক্তি—এর মধ্যে ১৯৫৬ সালের অবৈধ পাচার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২নং ধারার উপধারা (জি)-এর আওতায় থাকা সুরক্ষামূলক হোম (প্রোটেকটিভ হোম), বা ১৯৮৬ সালের কিশোরদের ন্যায়বিচার আইন বা জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট-এর উপধারা (জি)-এর আওতায় থাকা জুভেনাইল হোম এবং ১৯৮৭ সালের 'মানসিক স্বাস্থ্য আইনে'র ২নং ধারার উপধারা (জি)-এর আওতায় থাকা মানসিক হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের হেফাজতে থাকা সমস্ত ব্যক্তিকেই বোঝাবে।

১০ মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম মনুভাই প্রগাজিভাসি, এআইআর ১৯৯৬ এসসিআই। রাজ্যের বেসরকারি আইন কলেজগুলিকে রেট্রোস্পেকটিভ সুবিধার আওতায় ১৯৮২ সালের এপ্রিল থেকে অনুদান প্রকল্পের সহায়তা দেওয়ার জন্য মহারাষ্ট্র সরকারকে নির্দেশ দিতে আর্জি জানানো হয়।

১১ বর্তমানে ভারতের প্রধান বিচারপতি মাননীয় এইচ এল দাত্তু প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় টি এস ঠাকুর এই কর্তৃপক্ষের কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান।

১২ উক্ত আইনের ৬(১) ধারা

১৩ উক্ত আইনের ৬(২) ধারা

১৪ উক্ত আইনের ৯(১) ধারা

১৫ উক্ত আইনের ৯(২) ধারা

১৬ উক্ত আইনের ১১(এ) ধারা

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

এ রাজ্যে আলুচাষের হালহকিকত

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। এ রাজ্যেও কৃষির গুরুত্ব যথেষ্ট। কৃষি অর্থনীতিতে তাই আলুর এক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। খাদ্য নিরাপত্তাতেও এর ভূমিকা হেলাফেলার নয়। আলু চাষিরা কিন্তু ভালো নেই। কম ফলন আর বেশি ফলন-এর সাঁড়াশি আক্রমণে তাঁরা নাজেহাল। কেন এ দশা। এর কোনও কূলকিনারা আছে কি! তা নিয়েই এ লেখা। লিখেছেন **শান্তি মল্লিক।**

আলুচাষে দেশে উত্তরপ্রদেশের পরই পশ্চিমবঙ্গ। মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি হয় এই দুই রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশে কোনও বছর ফলনের ইতরবিশেষ হলে তার প্রভাব পড়ে গোটা দেশের উৎপাদনে। আলুচাষে চীন, রাশিয়া, পোল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর ভারতের ঠাঁই। এদেশ থেকে আলু রপ্তানির পরিমাণ কিন্তু নেহাতই কম। উৎপাদনে অগ্রণী দেশগুলির তুলনায় আমাদের আলুর বেশি দাম এজন্য দায়ী। এছাড়া এদেশে উৎপাদিত আলু মানের নিরিখেও নিরেস। ভারতে ৬২ শতাংশ আলু হেঁশেলে রান্নাবান্নায় লাগে। বীজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য তুলে রাখা হয় ২১ শতাংশ। আর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে দরকার ০.৫ শতাংশ। মাত্র .০৩ শতাংশ হয় রপ্তানি। ফসল তোলা, ঝাড়াই-বাছাই, হাট-বাজার নিয়ে যাওয়া এবং মজুত করার সময় নষ্ট হয় ১৭ শতাংশ।

এ মরশুমে গোটা দেশেই আলুর উৎপাদন বেশ ভালো। এ রাজ্যে তো বাম্পার ফলন। সৌজন্যে অনুকূল আবহাওয়া। আর রোগ বা পোকার আক্রমণ না হওয়া। পশ্চিমবঙ্গ হিমঘর অ্যাসোসিয়েশনের আশা এবার ফলন ১ কোটি ১০ লাখ টন। কারও কারও হিসেবে তা ১ কোটি ১৫/২০ লাখ টনের মতো। গত বছরের তুলনায় ২৫-৩০ লাখ টন বেশি। রাজ্যে মাথাপিছু আলু লাগে বছরে ৩৫ কেজি। বীজ ও প্রক্রিয়াকরণ বাবদ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে ৫০ শতাংশের বেশি। এই আলু পাঠানো হয় বিভিন্ন রাজ্যে। বেশ কিছুটা অপচয়ও হয়। আলুর ফলনে ওঠাপড়া লেগেই থাকে। বাজারে চাহিদা-জোগানের নীতি মেনে দামের ফারাক হয়। উৎপাদন বেশি হলে দাম যায় কমে। ফাঁপরে পড়েন চাষি। লোকসানের ভয়ে চাষি পরের বছর আলু লাগান কম জমিতে। দাম বাড়ে চড়চড়িয়ে। এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে নিস্তার নেই চাষির। দাম বা উৎপাদনে স্থিতিশীলতা আনার নেই কোনও ব্যবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি আলু হয় হুগলি জেলায়—রাজ্যে মোট উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এরপর পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং জলপাইগুড়ি। এই পাঁচ জেলাতে হয় ৭৫ শতাংশ আলু। উৎপাদিত আলুর জাতের মধ্যে চন্দ্রমুখী, জ্যোতি, পোখরান, চিপসোনা ও আটলান্টা উল্লেখযোগ্য। বাজারে চন্দ্রমুখীর দাম বেশি। এ রাজ্যে আলু ওঠে মূলত জানুয়ারির শেষদিক থেকে মার্চ ইস্তক। বেমরশুমে হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের আলু ঢোকে রাজ্যের বাজারে। তখন দাম চড়া থাকলেও তার ফায়দা নিতে পারেন না পশ্চিমবঙ্গের চাষিরা।

রাজ্যে হিমঘরের সংখ্যা প্রায় ৪৫০। এগুলিতে আলু মজুতের ক্ষমতা মেরেকেটে ৭০ থেকে ৭৫ লাখ টন। হিমঘরে যে পরিমাণ আলু মজুত রাখা সম্ভব, উৎপাদন হয়েছে তার তুলনায় ঢের বেশি।

অতিরিক্ত উৎপাদনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি হলে কোনও সমস্যা নেই। দাম একটু কমলেও অতিরিক্ত চাহিদা থাকলে চাষিদের মোট আয় কমে না। কেননা বাড়তি উৎপাদন কম দামের ক্ষতি উশুল করে দেয়। সমস্যাটা এখানেই। বাড়তি কোনও চাহিদা নেই। ফলে নামছে আলুর দাম। বেশি ফসল ফলিয়ে দুটো বেশি টাকা মেলা দূর অস্ত্। উপযুক্ত দাম না পেয়ে পথে বসতে চলেছেন চাষিরা। সংবাদ মাধ্যমের খবর, রাজ্যে ইতিমধ্যে কয়েকজন চাষি আত্মঘাতী। অভিযোগ, আলুর ন্যায্য দাম না মেলায় লোকসানের তাড়নায় এই আত্মহনন। আত্মহত্যার এই অভিযোগ অবশ্য মানতে নারাজ রাজ্য প্রশাসন। তাদের বক্তব্য অন্য কোনও কারণে তাঁরা আত্মঘাতী হয়েছেন।

দাম পড়ায় সহায়ক মূল্যে আলু কেনার দাবিতে বিক্ষোভ চলছে জেলায় জেলায়। পথ অবরোধও হচ্ছে অনেক জায়গায়। নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। সহায়ক মূল্যে ৫০ হাজার টন আলু কেনার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এছাড়া, চাষিদের কাছ থেকে আলু কিনে ব্যবসায়ীদের অন্য রাজ্য বা বিদেশে পাঠানোর অনুমতি দিয়েছে। রপ্তানির দরুন মিলবে ভরতুকিও। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচিকে নিয়ে গড়া ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শ্রীলঙ্কার মতো দেশ এ রাজ্য থেকে আলু কিনতে ইচ্ছুক। অনেকে অবশ্য মনে করেন, সমস্যা মোকাবিলায় এসব পদক্ষেপ আদৌ যথেষ্ট নয়। তাঁদের অভিযোগ, আলু রপ্তানি নিয়ে রাজ্য সরকার

বারংবার নীতি বদলানোয় অবস্থা জটিল। গতবার বেশ কয়েকটি রাজ্যে আলুর ফলন জুতসই হয়নি। উদ্বৃত্ত তেমন একটা ছিল না পশ্চিমবঙ্গেও। বাইরের চাহিদা মেটাতে গেলে রাজ্যে দাম বাড়বে এই আশঙ্কায় প্রশাসন কিছু বাধানিষেধ জারি করে। নানা টানাহ্যাঁচড়ায় ভিন রাজ্যের ব্যবসায়ীরা তিতিবিরক্ত। তাঁরা এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলু আমদানির জন্য তেমন একটা গা লাগাচ্ছেন না আর। এছাড়া গোটা দেশেই এবার কমবেশি আলুর ফলন ভালোই। এ রাজ্য থেকে বাইরে পাঠানোর সম্ভাবনা তাই কম। গতবার আলুর দাম ছিল তুলনামূলকভাবে বেশ চড়া। তার দরুন অবশ্য চাষিদের খুব একটা লাভ হয়নি। ফায়দা লুটেছে হিমঘর মালিক, ফড়ে আর একদল ব্যবসায়ী। অধিকাংশ আলু চাষি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক। ধারকর্জ করে তারা আলুচাষে নামেন। ফলন ওঠার পরপরই তা বাজারে বিক্রি করে শুধতে হয় মহাজন বা সমবায়ের ঋণ। বাজারে যখন দাম বাড়ে তখন তাঁদের হাতে বেচার মতো আর আলু থাকে না। কিছু বড় বড় চাষি অবশ্য আলু ধরে রাখার ক্ষমতা ধরেন। দাম বাড়লে তাঁদেরও পোয়াবারো। ছোট চাষিরা থাকেন যে তিমিরে সে তিমিরেই।

আর দাম কমলে তো চাষিদের সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ। আলুচাষে খরচা দেদার। ফসল বেচে তখন চাষের খরচ মেটানোই দুষ্কর। দেনার চাপে জর্জরিত চাষির তখন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি'। উপায়ান্তর না দেখে কেউ কেউ আত্মঘাতী হবার পথ বেছে নেন।

সমস্যা সমাধান ও চাষিদের স্বার্থে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কয়েকটি ব্যবস্থা নিতে বলেছে রাজ্য সরকারকে। নির্দেশ দিয়েছে কৃষিবিদ, বিপণন বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিয়ে একটি কমিটি গড়ার। রাজ্য প্রশাসনকে বেঞ্চ পরামর্শ দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সরাসরি আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য। সেইসঙ্গে কৃষিমণ্ডি তৈরি এবং সবজি মণ্ডিগুলিকে কাজে লাগাতে বলেছে। ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে চাষিদের আলু সরাসরি বিক্রি করার একটা ব্যবস্থা করা হোক। হাইকোর্টে শুনানি অবশ্য এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

আলুর ফলন কম বা বেশি—চাষির কাছে তা শাঁখের করাত। আসতে কাটে, যেতেও কাটে। ফুল্লরার এ বারোমাস্যার কোনও চটজলদি সমাধান নেই। রাজ্যের কৃষিতে আলুর গুরুত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তায় এর ভূমিকা মনে রেখে আলুর উৎপদনশীলতা বাড়াতে হবে। চাই যথেষ্ট সংখ্যক হিমঘর। সেইসঙ্গে চাষিদের জন্য অল্প সুদে ঋণ ও কম খরচে শস্যবিমা। বিদেশে রপ্তানির বাজার খুলতে আলুর মান বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া জরুরি। এখানকার আলুতে জল ও চিনির পরিমাণ তুলনায় বেশি। আলুর প্রক্রিয়াজাত পণ্য তৈরির ওপর জোর দিতে হবে। এজন্য উপযুক্ত জাতের আলু উৎপাদনে চাষিকে উৎসাহ দিতে চাষিদের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের এগিয়ে আসা দরকার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রাজ্যে কয়েকটি নামী সংস্থা আলু প্রক্রিয়াকরণ কারখানা চালাচ্ছে। এদের মধ্যে আছে একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানও। তাদের চাহিদামাফিক আলু উৎপাদনের জন্য সংস্থাগুলি চাষিদের সঙ্গে হাত মেলায়। বহুজাতিক সংস্থাটি বীজ, সার, মায় কীটনাশক পদার্থ—যাবতীয় উপকরণ জোগায় চাষিকে। বিনিময়ে উৎপাদিত আলু বিক্রি করতে হয় সেই সংস্থাকে। আলুর দাম ঠিক করা হয় আগে থেকেই। তাই, এ পড়তি দামের বাজারেও দেখা গেছে, রাজ্যের কিছু এলাকায় কোনও লোকসান সইতে হয়নি চাষিকে। এ ব্যবস্থায় ফায়দা দু'পক্ষেরই। চাষিরা পান তাঁদের বহু মেহনতের ফসলের ন্যায্য দাম। আর প্রয়োজনীয় মানের আলুর জোগান নিয়েও ভাবতে হয় না প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাকে। এ ধরনের অনেক চাষির মতে ন্যায্য দাম মেলার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চুক্তি-চাষই হাতিয়ার। চুক্তি-চাষই মুশকিল আসান। চাষির স্বার্থের কথা মাথায় রেখে বিষয়টি ভেবে দেখা জরুরি। নীতিগত কচকচি ছেড়ে বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা দরকার। আলু নিয়ে সমস্যা এক আধ বছরের নয়। সংকট আসে ঘুরেফিরে। এ থেকে রেহাই পেতে চাষি ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মেলবন্ধনে উৎসাহ জোগানোর দিকটি ভেবেচিন্তে দেখার দাবি রাখে।❑

[লেখক আকাশবাণী কলকাতার উপ-অধিকর্তা (সংবাদ)]

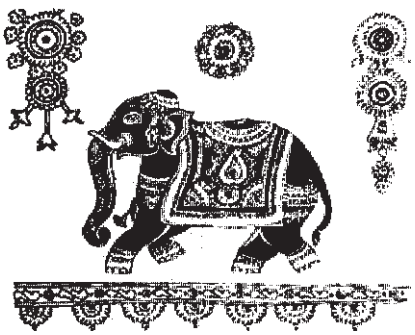

ঘো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫—১৫ মার্চ ২০১৫)

বহির্বিশ্ব

● **মালদ্বীপের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কারাদণ্ড:**

মালদ্বীপের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ নাশিদকে গ্রেপ্তার করে ১৩ বছর কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে বিরোধীনেতা নাশিদকে জঙ্গি-দমন আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর শাসনকালে এক বিচারককে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে, নাশিদকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে দোষী সাব্যস্ত করে মালের একটি আদালত। এর পর বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদুল্লা ইয়ামিনের সরকার এই রায়ে সিলমোহর দেয়।

মহম্মদ নাশিদের কারাদণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলি।

১৯৭৮ সালে মামুন আব্দুল গাইয়ুম মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ ৩০ বৎসর তিনি দেশ শাসন করেন। ২০০৮ সালে মালদ্বীপে প্রথম বহুদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ নির্বাচনে মামুন আব্দুল গাইয়ুমকে পরাজিত করে মহম্মদ নাশিদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর হাত ধরেই মালদ্বীপে নতুন করে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু তিন বছর ক্ষমতায় থাকার পর বিচার বিভাগ ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে তিনি পদত্যাগ করেন।

● **বাংলাদেশে নৌকাডুবিতে মৃত ৭০:**

ট্রলারের ধাক্কায় যাত্রীবোঝাই নৌকা তলিয়ে গেল পদ্মায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৭০ জনের। মৃতদের অধিকাংশই নারী এবং শিশু। মৃতদের অনেকেরই পরিচয় জানা যায়নি। নিখোঁজ বহু।

২২ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২টা নাগাদ শ'দেড়েক যাত্রী নিয়ে রাজবাড়ির পাটুরিয়া থেকে দৌলতদিয়ার উদ্দেশে রওনা হয় নৌকাটি। মাঝ নদীতে একটি মালবোঝাই ট্রলার নৌকাটিকে ধাক্কা মারে। জল ঢুকতে শুরু করে তাতে। উলটে যায় নৌকাটি।

বাংলাদেশি নৌবাহিনীর চেষ্টায় ৬০ জন যাত্রীকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ট্রলারের মালিক, চালক এবং সহকারীকে আটক করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় ট্রলারটিকে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশের সমুদ্র পরিবহণ দফতর।

পর্যাপ্ত সুরক্ষার অভাবে বাংলাদেশে নৌকাডুবির ঘটনা নতুন নয়। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩ তারিখেই মাঝ নদীতে নৌকা ডুবে মৃত্যু হয়েছিল এক নাবালক-সহ পাঁচ জনের। জানুয়ারি মাসে বঙ্গোপসাগরে ডুবে গিয়েছিল একটি মাছ ধরার নৌকা। দুর্ঘটনায় ৮ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। বাংলাদেশে সবচেয়ে ভয়াবহ নৌকাডুবি হয়েছিল গত বছর আগস্টে। তাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩০ জন।

● **অস্ট্রেলীয় অভিবাসন নীতি বদল:**

অভিবাসন নীতিতে ব্যাপক রদবদল আনতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী টোনি অ্যাবট নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এমনই ঘোষণা করলেন।

অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, দেশের নিরাপত্তা জোরদার করতে যদি কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছুটা কমিয়ে আনতে হয় তবে তেমনই করবে প্রশাসন। প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিত ছিল অস্ট্রেলিয়ার নিরাপদ আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা একাধিক কট্টরপন্থী সংগঠনের দিকে। পার্লামেন্টে অ্যাবট জানান, যাঁরা ধর্মাচরণের নাম করে ঘৃণা প্রচার করছেন, তাঁদের ওপর বিশেষ নজর থাকবে প্রশাসনের। এই কথা বলতে গিয়ে অহিংস কিন্তু কট্টরপন্থী সংগঠন 'হিজব-উত-তাহরির' নাম উদাহরণ হিসেবে দেন। ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব পাওয়ার বা সে দেশে যাওয়ার ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা যে অনেকটাই কঠিন হতে চলেছে তা স্পষ্ট হল প্রধানমন্ত্রীর কথায়।

● **জঙ্গি ঘাঁটিতে হানা মিশর সেনার:**

প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতাহ এল-সিসির নির্দেশে লিবিয়ায় আইএস জঙ্গিদের ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণ শিবিরে বিমানহানা চালায় মিশরীয় সেনা। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এই আক্রমণে মিশরকে পূর্ণ সহযোগিতা করল লিবিয়া সেনাবাহিনীর একাংশ।

লিবিয়ার পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আবু আল বারা আল-আজদি-কে 'প্রাদেশিক শাসনকর্তা' ঘোষণা করে এই অঞ্চলে অস্ত্রাগার ও প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলেছিল জঙ্গিরা। এর কয়েক দিন আগে, মিশর থেকে লিবিয়ার কাজের সন্ধানে যাওয়া ২১ জন খ্রিস্টানকে অপহরণ করে আই এস জঙ্গিরা। পরে প্রকাশ করা হয় ওই ২১ জনকে মাথা কেটে খুন করার ছবি। যে পদ্ধতিতে পশ্চিম এশিয়ায় 'জিহাদি জন' অপহৃত শ্বেতাঙ্গ ও জাপানিদের মাথা কেটে খুন করেছে, অবিকল একই পদ্ধতিতে আইএস-এর লিবিয়া শাখার ঘাতকরা খুন করল খ্রিস্টান বন্দিদের। দেরি না করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হামলার সিদ্ধান্ত নিলেন মিশরের প্রেসিডেন্ট এল-সিসি। লিবিয়ার এক সেনাকর্তা সাকের আল-জরুসি এই বিষয়ে মিশরীয় বিমানবাহিনীকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। হামলায় সাকেরের অধীনস্থ লিবীয় সেনার একাংশও যোগ দিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। অন্তত ৪০-৫০ জন জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছে।

এই দেশ

● **ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে নতুন মোড়:**

আগামী দিনে ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক কোন পথে চলবে তা নিয়ে নতুন আশার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কায় রাজনৈতিক পালাবদল

ঘটে যাওয়ার পর আর দেরি না করে সে দেশের সঙ্গে সম্পর্কে নতুন মাত্রা আনতে তৎপর নরেন্দ্র মোদী সরকার।

একদিকে ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে চার দিনের সফরে ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখ নয়াদিল্লিতে হাজির হন শ্রীলঙ্কার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপালা সিরিসেনা। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, অসামরিক পরমাণু চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছে দু'দেশ। এই প্রথম এই ধরনের চুক্তি করল কলম্বো।

আবার মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলম্বো সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কূটনীতিকেরা জানিয়েছেন, দু'দেশের সহযোগিতার নতুন রাস্তা খুলে গেল। তামিল স্বার্থকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া পরিকাঠামো এবং শক্তি ক্ষেত্রে সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া, কৌশলগত মৈত্রীর মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার।

● **রেল-মানচিত্রে অরুণাচলপ্রদেশ:**

অরুণাচলপ্রদেশের ২৯তম প্রতিষ্ঠাদিবসে ওই রাজ্যের সঙ্গে বাকি দেশের প্রথম রেল যোগাযোগের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে ছিলেন অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী নাবাম টুকি, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু ও রাজ্যপাল নির্ভয় শর্মা।

নরেন্দ্র মোদী মঞ্চেই বোতাম টিপে সবুজ পতাকা নাড়ান। সেই সঙ্গে, নাহারলাগুন স্টেশন থেকে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করে। যার হাত ধরে, দেশের রেল-মানচিত্রে ঢুকে পড়ল অরুণাচল।

এদিন ৩২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ পরিবাহী প্রকল্প ও ইটানগর পানীয় জল প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্বের জন্য গত বছরে ৫৩ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

● **কালো টাকা উদ্ধারে নতুন সংস্থা:**

কালো টাকা উদ্ধারে গতি আনতে অতিরিক্ত একটি আর্থিক তদন্ত সংস্থা গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'বিশেষ তদন্তকারী সংস্থা' (সিট)। সেন্ট্রাল ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (সিইআইবি) নামে ওই সংস্থা তদন্তকারী ও এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলির মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার কাজ করবে। এর ফলে কালো টাকা উদ্ধারের ক্ষেত্রে মোট ১২টি সংস্থা 'সিট'-কে সাহায্য করবে।

অন্য দিকে, সুইৎজারল্যান্ড সরকার জানিয়েছে, কালো টাকা উদ্ধারের জন্য ২০১৮ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ভারতকে। আন্তর্জাতিক 'ওইসিডি' সংস্থা 'অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ অব ইনফর্মেশন' বা স্বাভাবিকভাবে তথ্য আদানপ্রদানের যে পন্থা নিয়েছে, তাতে অন্য দেশের সঙ্গে শামিল হয়েছে ভারতও। সে নিয়ম কার্যকর হলে সুইৎজারল্যান্ডের ব্যাংকে যে সব ভারতীয়ের অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তাঁদের বিস্তারিত তথ্য ২০১৮ সালে ভারতের হাতে তুলে দেবে সে দেশের সরকার। সেক্ষেত্রে, অ্যাকাউন্ট নম্বর, নাম, ঠিকানা, জন্মের তারিখের মতো তথ্য হাতে এলে ভারতের পক্ষে কালো টাকা উদ্ধার অনেকটাই সহজ হবে।

● **জম্মু-কাশ্মীরে পিডিপি-বিজেপি সরকার:**

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে জম্মু-কাশ্মীরে সরকার গড়ল পিডিপি-বিজেপি জোট। জম্মুর জোরাওয়ার প্রেক্ষাগৃহে শপথ নিল মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সইদ সহ ২৫ সদস্যের মন্ত্রিসভা। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বিজেপি-র গুরুত্বপূর্ণ নেতারা। দু'দলের মধ্যে মতপার্থক্য স্বীকার করেই অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সরকার চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সইদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সরকারকে 'ঐতিহাসিক সুযোগ' বলে বর্ণনা করেছেন।

এই রাজ্য

● **প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার:**

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদলকে নিয়ে ৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের ঋণের বোঝা সংক্রান্ত সমস্যাটির কথা উত্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে ঋণের বোঝা, ফলে চড়া সুদ প্রদান করতে হচ্ছে রাজ্যকে। মুখ্যমন্ত্রী এই ঋণের বোঝার থেকে অব্যাহতির আর্জি জানান প্রধানমন্ত্রীকে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জানান, তিনি সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রবাদে বিশ্বাসী। তিনি বরাবরই বলেছেন, শক্তিশালী রাজ্যই ভারতবর্ষকে আরও মজবুত করতে পারে এবং সেজন্যই রাজ্যগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে যাতে মানুষের বিকাশের চাহিদা মেটানো যায়।

পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতাকে তাঁর নিজের স্বার্থেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শামিল হতে হবে, যাতে ওই অঞ্চলটি উপকৃত হয়। এর জন্য 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি রয়েছে। এই অঞ্চলে বহু কর্মদক্ষ মানুষ রয়েছেন, রয়েছে প্রচুর সহায়-সম্পদও। কথা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার উন্নয়নে তিনি বদ্ধপরিকর।

● **মুখ্যমন্ত্রীর ঢাকা সফর:**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিন দিনের সফরে ঢাকা যান। তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর।

কূটনীতির মহলে তিস্তা চুক্তি ও ছিটমহল বিনিময়ের বিষয়ে তাঁর অবস্থান নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। ঢাকার উদ্দেশে কলকাতা ছাড়ার আগে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে শুভকামনা জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরসঙ্গী হিসেবে ঢাকা যান চলচ্চিত্র নির্মাতা গৌতম ঘোষ, অভিনেত্রী মুনমুন সেন, অভিনেতা প্রসেনজিৎ, দেব, কণ্ঠশিল্পী নচিকেতা ঘোষ প্রমুখ।

● **রাজ্যে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড—কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন:**

পশ্চিমবঙ্গে তিন বছরের মধ্যে ৭২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫০৫ জন কৃষককে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রত্যেকটি রাজ্যে কিছু নির্ধারিত সংখ্যক কৃষককে এই কার্ড দেওয়া হবে।

দেশের প্রত্যেক কৃষককে সাহায্য করতে চলতি অর্থবর্ষে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড প্রকল্প চালু করা হয়েছে। অনলাইনে এই কার্ড ও সার ব্যবহারের পরামর্শ প্রদানের সফ্‌টওয়্যার তৈরি করার কাজে কেন্দ্র,

রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করবে। সব মিলিয়ে দেশের প্রায় ১৪ কোটি কৃষক তিন বছরের মধ্যে এই কার্ড পাবে।

এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল কৃষকদের নিজেদের চাষের জমির পুষ্টির অভাবে মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা। মাটি পরীক্ষার জন্য রাজ্যস্তরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও আই.সি.এ.আর-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণাগারগুলির উন্নতিসাধন করা হবে। জেলাগুলিতে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে পুষ্টি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হবে।

● **ইকো-ট্যুরিজম বোর্ড গঠন:**

পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রকে রক্ষা করে পর্যটন বিকাশে ইকো-ট্যুরিজম বোর্ড গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং আইন সংশোধনে বিধানসভায় বিল গৃহীত হল। কেএমডিএর ধাঁচেই বিধিবদ্ধ এই বোর্ড গঠিত হবে। নেতৃত্বে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাইস চেয়ারম্যান হবেন মুখ্যসচিব। ১৫ সদস্যের বিধিবদ্ধ এই বোর্ড বছরে অন্তত চার বার বৈঠক করবে।

এই বিল নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, পর্যটনের নামে বনভূমি, জলাভূমি ও সমুদ্র উপকূল এলাকায় বেআইনি হোটেল নির্মাণ করতে পারবে না। আলোচনায় সিপিএমের গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, আনিসুর রহমান, তৃণমূল কংগ্রেসের জটু লাহিড়ি, কংগ্রেসের নেপাল মাহাতো প্রমুখ অংশ নেন।

● **রাজ্যে নতুন ৫ শিল্পপার্কের ভাবনা:**

রাজ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে আরও বেশি বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে পাঁচটি নতুন শিল্পপার্ক তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম। এই পাঁচটি শিল্পপার্ক বর্ধমানের শক্তিগড়, বাঁকুড়ার বড়জোড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের খাসজঙ্গল, বীরভূমের বোলপুর এবং শিলিগুড়ির ডাবগ্রামে তৈরি হবে। শিল্পপার্কগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নাবার্ডের (ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট) রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (আরআইডিএফ) থেকে জোগাড় করবে রাজ্য সরকার।

বেঙ্গল শ্রেয়ি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডকে শিল্পপার্কগুলির বিশদ প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বিশদ প্রকল্প রিপোর্টে নাবার্ডের অনুমোদন মিলেছে বলে জানিয়েছেন নিগমের চেয়ারম্যান কর্নেল সব্যসাচী বাগচি।

সব্যসাচীবাবু আরও জানান, রাজ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের জন্য ৫৩০টি প্লট তৈরি করা রয়েছে। আগ্রহী শিল্পসংস্থাগুলিকে ৬টি কিস্তিতে টাকা পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সর্বোপরি ২৫ শতাংশ ছাড়ও দেওয়া হচ্ছে। জমি, জলনিকাশি এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করে দিচ্ছে। কাজেই শিল্প সংস্থাগুলির আরও বেশি করে উদ্যোগী হওয়া দরকার। শিল্পপার্ক সমেত বিভিন্ন প্রকল্পের ট্রানজাকশন অ্যাডভাইসর নিয়োগ করা হয়েছে ক্রিসিল-কে।

অর্থনীতি

● **প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ:**

সরকার গঠনের ন'মাস বাদে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হল। ২৩ ফেব্রুয়ারি সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি সুরেশ প্রভু ২০১৫-১৬-র রেল বাজেট পেশ করেন। চলতি বছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রকাশিত হওয়ার পরের দিন, অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি আগামী অর্থবর্ষের জন্য সাধারণ বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

● **পাইকারি বাজারদর জানুয়ারিতে সর্বনিম্ন:**

বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমার প্রভাব পড়ল সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির উপর। পাইকারি মূল্য সূচকের ভিত্তিতে হিসাব করা এই হার নামল গত সাড়ে পাঁচ বছরে সবচেয়ে নীচে। যার জেরে জানুয়ারিতে দাম বাড়ার বদলে তা সরাসরি কমেছে ০.৩৯ শতাংশ হারে। এর আগে সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি ০.৪০ শতাংশ কমেছিল ২০০৯-এর জুনে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, তিন মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয় দফায় দাম সরাসরি কমল, যার অর্থ মূল্যবৃদ্ধি নামল শূন্যের নীচে। এর আগে নভেম্বরে পাইকারি দর কমেছিল ০.১৭ শতাংশ হারে (সংশোধিত হার), যদিও আগের হিসাবে মূল্যবৃদ্ধি ছিল ০ শতাংশ। আর ডিসেম্বরে মূল্যবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ০.১১ শতাংশে।

জানুয়ারিতে শুধু জ্বালানি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রেই দাম সরাসরি কমেছে ১০.৬৯ শতাংশ। যদিও বাজারের আগুন পুরো নেবেনি। এই সময়ে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ছ'মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেড়ে ছুঁয়েছে ৮ শতাংশ। কল-কারখানায় তৈরি পণ্যের দাম বেড়েছে ১.০৫ শতাংশ।

● **শিল্পের ছাড়পত্র নেটে:**

এদেশে লগ্নি করার জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র অনলাইনে এক জায়গায় পেতে পোর্টাল চালু করল কেন্দ্রীয় সরকার। ওই ওয়েবসাইটে আপাতত মিলবে ১১টি ছাড়পত্র। এর মধ্যে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দেবে ৪টি। রিজার্ভ ব্যাংক ২টি, ইপিএফও ১টি, বাণিজ্য মন্ত্রক ২টি। আর ২টি (প্যান ও ট্যান নম্বর) আসবে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের কাছ থেকে। তাছাড়া, এ দেশে কোন ব্যবসায় টাকা ঢালতে কী কী ছাড়পত্র প্রয়োজন, সে সম্পর্কেও তথ্য মিলবে এখানে। আগামী দিনে সম্প্রসারিত হবে এই পরিষেবা।

শুধু তা-ই নয়। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে, দেশে লগ্নির আদর্শ পরিবেশ তৈরি করতে হলে, সহজে ছাড়পত্রের বন্দোবস্ত করতে হবে রাজ্যগুলিকে। তাই সেখানেও অনলাইনে ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা জরুরি। আর সেই কারণেই এই পোর্টালে রাজ্যগুলির ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থাও চালু হচ্ছে। এ জন্য প্রাথমিকভাবে দশটি রাজ্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

● **লোকসভায় পাশ কয়লা বিল, নিলাম খনি:**

লোকসভায় পাশ হল কয়লা বিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল কয়লাখনিগুলি নিলাম করতে দু'দফায় অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল কেন্দ্র। যা আইনে পরিণত না-হলে সমস্যায় পড়ত বর্তমানে চলা খনি নিলাম। ৪ মার্চ পাশ হওয়া কোল মাইন্স (স্পেশাল প্রভিশন্স) ২০১৫ বিলটি ওই অর্ডিন্যান্সেরই জায়গা নেবে। কেন্দ্রীয় কয়লা ও বিদ্যুৎমন্ত্রী পীযুষ গয়াল বলেন, দেশে বিদ্যুৎ সমস্যা মেটাতে এটা জরুরি। এর জেরে খনি নিলাম প্রক্রিয়াতেও স্বচ্ছতা আসবে। বন্ধ হবে কয়লা শিল্পে সংস্থাগুলির একচেটিয়া কারবার। তবে এ দিনও বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিভিন্ন বিরোধী দল।

এ দিকে, দ্বিতীয় দফার কয়লা ব্লক নিলাম শুরু করেছে কেন্দ্র। প্রথম দিনেই নিলাম হয়েছে ৩টি খনি। যার মধ্যে বৃন্দা অ্যান্ড সাসাই খনিটি পেয়েছে উষা মার্টিন। জিৎপুর ও মৈত্র খনি দু'টি পেয়েছে যথাক্রমে আদানি পাওয়ার ও জেএসডব্লিউ স্টিল। এই পর্যায়ে ১৫টি ব্লক নিলামে তুলছে কেন্দ্র। জমা পড়েছে ৮০টি বৈধ দরপত্র।

● **ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পে ৩,০০০ কোটি ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক:**

ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ৫০ কোটি ডলার (প্রায় ৩,০৫০ কোটি টাকা) ঋণ মঞ্জুর করল বিশ্বব্যাংক। স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (সিডবি) এবং পার্টিসিপেটিং ফাইন্যানশিয়াল ইনস্টিটিউসন্স (পিএফআই)-এর মাধ্যমে শিল্প সংস্থাগুলিকে সরাসরি এই ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, যার মধ্যে থাকবে নতুন সংস্থা চালু করতে চাইলে টাকা জোগানো এবং পরিষেবা ও উৎপাদন শিল্পে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

● **সুদ কমাল রিজার্ভ ব্যাংক:**

ঋণনীতি পর্যালোচনার নির্দিষ্ট দিনের মাসখানেক আগেই সুদ কমিয়ে দিলেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর। আচমকাই ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমানোর কথা ঘোষণা করে শীর্ষ ব্যাংক। এর ফলে স্বল্প মেয়াদে ব্যাংকগুলিকে ঋণ দেওয়ার সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক যে-হারে সুদ নেয়, সেই রেপো রেট দাঁড়াল ৭.৫ শতাংশ। এ নিয়ে গত দু'মাসে দু'বার শীর্ষ ব্যাংক সুদের হার কমানোর কথা ঘোষণা করল। ওই দু'দফায় রেপো রেট কমানো হল মোট ৫০ বেসিস পয়েন্ট। এর আগে ১৫ জানুয়ারি তা ৮ শতাংশ থেকে কমে হয়েছিল ৭.৭৫ শতাংশ। এ বার যে-বিষয়টি দেখার তা হল, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও রিজার্ভ ব্যাংকের পথে হেঁটে সুদের হার কমায় কি না। এর আগের দফায় যখন ২৫ বেসিস পয়েন্ট সুদ কমেছিল, তখন কিন্তু গোটা তিনেক ব্যাংক ছাড়া বাকি কেউই সুদের হার কমানোর রাস্তায় হাঁটেনি।

● **রেলে দেড় লক্ষ কোটি লগ্নি এলআইসি-র:**

ভারতীয় রেলের সঙ্গে সমঝোতাপত্র সই করল এলআইসি (ভারতীয় জীবনবিমা নিগম)। পাঁচ বছরে রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে দেড় লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে তারা।

রেলের ইতিহাসে এটি বৃহত্তম লগ্নি। শুধু তা-ই নয়, এই বিপুল অঙ্ক একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থার কাছ থেকে দীর্ঘ (৩০ বছর) মেয়াদে পাচ্ছে তারা। প্রথম পাঁচ বছরে ধার শোধ করতে হবে না। গুনতে হবে না সুদও।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **রোটাভাইরাসের মোকাবিলায় দেশজ টীকা:**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৯ মার্চ এক অনুষ্ঠানে দেশজ উপায়ে উদ্ভাবিত টীকা 'রোটাভ্যাক'-এর উদ্বোধন করেন। দেশজ প্রযুক্তিতে নির্মিত এই টীকা ডায়রিয়ার কারণে নবজাতক মৃত্যুর সমস্যা মোকাবিলায় চালু প্রয়াসকে আরও জোরদার করবে।

প্রতি বছর রোটাভাইরাসের কারণে যে ডায়রিয়া হয় তাতে প্রায় ১০ লক্ষ শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় এবং পাঁচ বছর বয়সের কম প্রায় ৮০ হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটে। প্রভাবিত পরিবারগুলির ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি ভাইরাসজনিত পেটের অসুখ দারিদ্রসীমার বহুসংখ্যক ভারতীয় পরিবারকে আরও সমস্যাজীর্ণ করে তোলে। দেশের ওপর লক্ষণীয় আর্থিক বোঝার কারণও হয়ে ওঠে।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, দেশজ উপায়ে রোটাভাইরাস টীকার এই উদ্ভাবন ভারতে আরও উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণা, উন্নয়ন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

● **বধিরতার আশঙ্কা ১১০ কোটির:**

ভয়ানক পরিণতির দিকে এগোতে চলেছে মানুষ। আশঙ্কাজনক ভাবে কমে আসছে আমাদের শোনার ক্ষমতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তার ভিত্তিতে বলা যায় পৃথিবীর অন্তত ১১০ কোটি মানুষের বধির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রধানত দায়ী স্মার্টফোন, নানাবিধ ইয়ারপ্লাগ ও অসংযত জীবন যাপন।

'আন্তর্জাতিক ইয়ার কেয়ার ডে'র একদিন আগে (মার্চের ৩ তারিখ), যে রিপোর্ট হু প্রকাশ করেছে তাতে জানা গিয়েছে, স্মার্টফোনে বাজতে থাকা গান ইয়ারপ্লাগের মাধ্যমে ক্রমাগত শুনতে থাকার অনিবার্য পরিণতি অকাল বধিরতা। গবেষকরা বলছেন, ৮৫ ডেসিবেল শব্দ একনাগাড়ে আট ঘণ্টা বা ১০০ ডেসিবেল শব্দ ক্রমাগত ১৫ মিনিট শুনলে শ্রবণযন্ত্রের ভয়াবহ ক্ষতি হয়। অত্যাধুনিক ফোনগুলি থেকে এমনই জোরে গান শুনতে অভ্যস্ত নতুন প্রজন্ম। এখানেই শেষ নয়। হু-র অভিযোগের তালিকায় রয়েছে নাইটক্লাব ও অন্যান্য বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শব্দ উৎপাদক বিশাল পাওয়ারহাউস বা অন্য অতিকায় স্পিকারগুলিও। এই ক্লাবগুলিতে তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট এবং শব্দ নিরোধক ঘরে প্রবল আওয়াজে গান ও বাজনা শোনানো হয়। তরুণ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের শ্রবণযন্ত্র এর ফলেও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

● **ক্যানসার-যুদ্ধে নতুন দিশা:**

বিশ্বের সাতটি প্রতিষ্ঠানের ২৩ জন বিজ্ঞানীর একটি দল দেখিয়েছে কীভাবে ক্যানসার-টিউমারের অংশকে শরীরের বাইরে এনে তার উপরে ওষুধ প্রয়োগ করে নিশ্চিন্ত হয়ে নেওয়া যায়, কোন ওষুধটি কার্যকর হবে, আর কোনটা নয়। পুরো প্রক্রিয়াটির পোশাকি নাম 'ক্যান্সস্ক্রিপ্ট'। আন্তর্জাতিক স্তরের বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার'-এ গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গিয়েছে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক মহলে।

তাঁরা বলছেন, ওষুধের কার্যকারিতা আগাম নিশ্চিত করা গেলে রোগীর আয়ু যেমন বাড়বে, তেমন ওষুধের ব্যর্থতার খেসারত হিসেবে বিপুল টাকার অপচয়ও রোখা যাবে।

গবেষণা-দলের তিন বাঙালি বিজ্ঞানী হলেন হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের সহকারী অধ্যাপক শিলাদিত্য সেনগুপ্ত, বেঙ্গালুরুর এক গবেষণা সংস্থার অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর বিশ্বনাথ মজুমদার এবং ওই সংস্থারই চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার প্রদীপ মজুমদার।

খেলার জগৎ

● **আইপিএল নিলামে ফের শীর্ষে যুবরাজ সিং**

গতবার ১৪ কোটি টাকার সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার যুবরাজ এবারের আইপিএল নিলামে বিক্রি হলেন ১৬ কোটি টাকায়। বেঙ্গালুরু ছেড়ে এ বার যুবরাজের ঠিকানা দিল্লি।

ভারতীয় বিশ্বকাপ দল থেকে অনেক দূরে থাকা এই নিলামে দ্বিতীয় দামি ক্রিকেটার হয়ে গেলেন দীনেশ কার্তিক। ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় তাঁকে নিল যুবরাজেরই পুরোনো টিম আরসিবি।

কুমার সঙ্গকারা, মাহেলা জয়বর্ধনে, হাসিম আমলা, লিউক রঞ্চিরা অবিক্রীত। তবে তৃতীয় দামি ক্রিকেটার হিসেবে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথেউসকে (৭ কোটি ৫০ হাজার টাকা) খেলতে দেখা যাবে ডেয়ারডেভিলসে। বিশ্বকাপ টিমে যাঁকে না নেওয়া নিয়ে এত বিতর্ক সেই মুরলী বিজয়কে ৩ কোটি টাকায় কিনে নিল প্রীতি জিন্টার টিম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব।

শাহরুখ খানের কেকেআরের সবচেয়ে দামি, অনামী স্পিনার কেসি কারিয়াপ্পা (২ কোটি ৪০ লক্ষ)। টিমে এলেন ৪৪ বছরের চায়নাম্যান ব্র্যাড হগও (৫০ লক্ষ)। অ্যারন ফিঞ্চ (৩ কোটি ২০ লক্ষ) গেলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ফিল হিউজের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর শিরোনামে চলে আসা অজি পেসার শন অ্যাবটকে ১ কোটি টাকায় নিল বেঙ্গালুরু।

এ বার দিল্লি ছেড়ে দেওয়া লক্ষ্মীরতন শুক্লকে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে নিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

● **ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড—শীর্ষে ডালমিয়া:**

প্রায় এক দশক পর ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে জগমোহন ডালমিয়ার প্রত্যাবর্তন হয়েছে। যেখানে নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন ও শরদ পওয়ার দুই মহারথীর ভাগ্যই দোদুল্যমান অবস্থায় থেকে গেল, সেখানে ডালমিয়া কিনা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট পদে একমাত্র প্রার্থী।

২০০৫-এ কলকাতার বোর্ড বৈঠক থেকেই চিরপ্রতাপশালী ডালমিয়া ব্রাত্য হয়ে যান। কিন্তু তাঁর অসম্মান চরমে পৌঁছয় এক বছর বাদে জয়পুরে বোর্ডের বৈঠকে। বোর্ড ২৯-১ ভোটে তাঁকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। মুম্বইয়ের আদালত জামিন অযোগ্য পরোয়ানাও জারি করে। অবশেষে চেন্নাইয়ে তাঁর আনুষ্ঠানিক নির্বাচন হয় ২ মার্চ, ২০১৫।

বিনা ভোটে দুই ভাইস প্রেসিডেন্টও ক্ষমতায় এসেছেন—অসমের গৌতম রায় এবং অন্ধ্রপ্রদেশের জি গঙ্গারাজু।

বিবিধ সংবাদ

● **৮৭তম অস্কার:**

৮৭তম অস্কার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অবশ্য বাজি জিতল 'বার্ডম্যান'।

ন'টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে, শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিত্রনাট্য এবং শ্রেষ্ঠ সিনেমাটোগ্রাফি, এই চারটি বিভাগে পুরস্কার পেল বার্ডম্যান। সেই সঙ্গে টানা দু'বছর মেক্সিকোর কোনও পরিচালক সেরা বিবেচিত হলেন। এবার এই শিরোপা উঠল আলেহান্দ্রো গনজালেজ ইনারিতুর মাথায়। গত বছর 'গ্রাভিটি' ছবির জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন আলফান্সো কুয়ারোন। ছটি বিভাগে মনোনীত হয়েও 'বয়হুড' পেল মাত্র একটি পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী বিভাগে। একটি করে অস্কার পেল 'দ্য ইমিটেশন গেম', 'আমেরিকার স্নাইপার' এবং 'সেলমা'।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এক বিখ্যাত হোটেলের কর্মীর অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে ছবি 'দ্য গ্র্যান্ড বুদাপেস্ট হোটেল' চারটি অস্কার পেলেও সেগুলি এসেছে কস্টিউম ডিজাইন, মেক আপ, প্রোডাকশন ডিজাইন এবং ওরিজিনাল স্কোরের মতো কারিগরি বিভাগে।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে দুটি ছবি, 'দ্য থিয়োরি অব এভরিথিং' এবং 'স্টিল অ্যালিস'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী নির্বাচিত হলেন এডি রেডমেইন এবং জুলিয়ান মুর। প্রথম ছবির বিষয়বস্তু বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংয়ের এএলএস নামে দুরারোগ্য মোটর নিউরন ডিজিজ। দ্বিতীয় ছবির বিষয়বস্তু এক শিক্ষিকার স্মৃতিলোপ বা অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ। এর আগে চারবার মনোনীত হলেও অস্কার এতদিন মুরের অধরাই ছিল। 'বয়হুড'-এ, এক সিঙ্গল মাদারের চরিত্রে অভিনয় করে প্যাট্রিশিয়া আর্কেট পেলেন শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রীর শিরোপা। 'হুইপল্যাশ' ছবিতে এক বদমেজাজি সংগীত শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সেরা সহ-অভিনেতা হিসাবে পুরস্কৃত হলেন জে কে সিমন্স। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের মধ্যে, সেরা বিদেশি ছবি বিবেচিত হল পোল্যান্ডের 'ইডা', এবং সেরা পূর্ণদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র বিবেচিত হল 'সিটিজেনফোর'।

● **শার্লক হোমসের 'অপ্রকাশিত' গল্পের খোঁজ:**

শার্লক হোমসকে নিয়ে আর্থার কোনান ডয়েলের প্রায় ৮০ বছর আগে লেখা একটি 'অপ্রকাশিত' গল্পের খোঁজ পাওয়া গেছে। গল্পটির কথা কেউ জানতে পারত না যদি না অন্য জিনিসপত্র খুঁজতে গিয়ে চিলেকোঠার এক কোণ থেকে বাদামি কাগজে মোড়া দশ ইঞ্চি লম্বা এবং তিন ইঞ্চি চওড়া সেই বইটি বেরিয়ে পড়ত। ওয়াল্টার এলিয়ট নামে বছর আশির এক ঐতিহাসিক তাঁর চিলেকোঠা থেকে বইটির একটি কপি খুঁজে পেয়েছেন।

১৯০২ সালের বন্যায় স্কটল্যান্ডের সেলকির্কের একটি কাঠের সেতু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৪ সালে নতুন সেতু গড়ার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা তিন দিনের একটি কর্মসূচির আয়োজন করেন। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে স্থানীয়দের লেখা ছোটগল্পের একটি সংকলন বাজারে বিক্রি করা হয়, যাতে সেই অর্থ দিয়ে সেতু তৈরি করা সম্ভব হয়।

সেলকির্কে প্রায় ঘুরতে আসতেন কোনান ডয়েল। সেতু তৈরি করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের এমন পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে ১৩০০ শব্দের একটি ছোটগল্প লিখে ফেলেন ডয়েল। ওয়াটসনকে সঙ্গে নিয়ে শার্লক হোমস সেলকির্কে বেড়াতে আসছেন এই ছিল সেই ছোটগল্পের বিষয়বস্তু। সেই ছোটগল্পটিই জায়গা পেয়েছে সেলকির্কের বাসিন্দাদের লেখা ছোটগল্পের সংকলনে। গোটা গল্প সংকলনটি ক্রস কিজ সেলকির্ক পপ-আপ কমিউনিটি মিউজিয়ামে সাধারণ মানুষকে দেখানোর জন্য রাখা হয়েছে।

● **এক ঘণ্টায় দেড় হাজার স্নোম্যান জাপানে:**

এবারের শীতে জাপানে তুষারপাতের কমতি ছিল না। দ্বীপের উত্তর দিকের কিছু কিছু জায়গা তো বেশ কয়েক ফুট বরফের নীচে চলে গিয়েছে। তারই সুযোগ নিয়ে এখানের এক শহরের বাসিন্দারা গড়ে ফেললেন অভিনব এক বিশ্বরেকর্ড। সবাই মিলে হাত লাগিয়ে তৈরি করে ফেললেন ১,৫৮৫টি তুষারমানব। প্রতিটি স্নোম্যান ৯০ সেন্টিমিটার করে উঁচু। □

সংকলক : পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

জা নে ন কি?

ডাক পরিষেবায় নাগরিক অধিকার

মলয় ঘোষ

পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির সাফল্যের প্রাথমিক কারণই হল সুশাসন। ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সংবিধান কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনিক সংস্কারের কথা ভাবা হয়েছে। স্বাধীনতার আগে প্রশাসনিক সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনকে মজবুত করার লক্ষ্যে। স্বাধীনতার পর সুশাসনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়। সরকারি পরিষেবা যে আমজনতার অধিকার, এই দাবি থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'সিটিজেনস্ চার্টার' বা 'নাগরিক সনদ' প্রকাশ করে জনসাধারণের দাবিকে মান্যতা দিতে শুরু করে। ঠিক তেমনি ডাক পরিষেবার ক্ষেত্রেও 'নাগরিক সনদ' আছে যা ওয়েবসাইটে (www.indiapost.gov.in) এবং এর ক্ষুদ্র সংস্করণ সমস্ত ডাকঘরেই পাওয়া যায়। নাগরিক সনদ অনুযায়ী একজন উপভোক্তা যথাযথ ডাক পরিষেবা পেতে পারেন।

চিঠি ও পার্সেল

চিঠি লেখার চল প্রায় উঠেই গেছে। কিন্তু এখনও যাঁরা পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড বা খামে করে চিঠি পাঠান সেই চিঠি যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছোয়, তার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে ডাকবিভাগ। প্রথম শ্রেণির অ-রেজিস্ট্রীকৃত চিঠি (বা আন-রেজিস্ট্রার্ড মেল) একই পৌর এলাকার মধ্যে (পোস্ট করার দিন সহ) ২ দিনের মধ্যে পৌঁছোনোর কথা। অন্য মহানগরের (মেট্রো শহর) ক্ষেত্রে ২-৩ দিনের মধ্যে; একই রাজ্য বা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মধ্যে ৩-৪ দিনের মধ্যে এবং দেশের অন্যান্য জায়গায় চিঠি ৫-৬ দিনের মধ্যে পৌঁছোনোর কথা।

বিজনেস পার্সেলের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা আছে। যেমন, 'লোকাল' এলাকায় ২-৩ দিন, অন্য মহানগরের ক্ষেত্রে ৩-৪ দিন, একই রাজ্য বা পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ক্ষেত্রে ৩-৪ দিন এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চিঠি ৫-৭ দিনের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ আছে নাগরিক সনদে। স্পিড পোস্টের বেলায় পৌর এলাকা ও মেট্রো শহরের ক্ষেত্রে ২ দিন (পোস্ট করার দিন সহ) ধার্য করা থাকলেও দেশের অন্যান্য জায়গায় ৪-৬ দিনের মধ্যে পৌঁছোনোর কথা। তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে, যে সব চিঠি 'কাট অফ টাইম'-এর (দিনের নির্দিষ্ট সময়) পরে বুকিং করা হয় সেক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। আবার রবিবার বা ছুটির দিনও এর আওতায় আসবে না। এমনকী কোনও শহরে কারফিউ, বন্ধ বা ধর্মঘটের কারণেও বিঘ্ন হতে পারে। আবার বিমান, ট্রেন, বাস পরিষেবা যা ডাক বহন করে সেগুলির পরিষেবা বিঘ্নিত হলেও বিলম্ব হয়। এসব ক্ষেত্রে নিয়মে কিছু ছাড় আছে।

ডাক পরিষেবার মধ্যে স্পিড পোস্ট, বিজনেস পোস্ট, এক্সপ্রেস পার্সেল, মিডিয়া পোস্ট, গ্রিটিং পোস্ট, লজেস্টিক পোস্ট প্রভৃতি পড়ে। এই সমস্ত পরিষেবাও গ্রাহক নিতে পারেন।

পাশবই

ছুটির দিন বাদে যে কোনও দিন ডাকঘরের কাজের সময়ের মধ্যে অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। ডাকঘরের ক্ষেত্রে পাশবই হল গ্রাহকের পরিচয়। পাশবই থাকবে গ্রাহকের কাছে। অনেক সময় কিছু এজেন্ট টাকা জমা বা তোলার জন্য পাশবই রেখে দেন। কিন্তু এটা কখনওই কাম্য নয়। এই পাশবই যদি হারিয়ে যায়, ডুপ্লিকেট পাশবই-এর জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে আবেদন করা যায়। যে ডাকঘরে অ্যাকাউন্টটি আছে সেখানে আবেদনপত্রটি জমা দিলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘর ডুপ্লিকেট পাশবই ইস্যু করবে। এর জন্য আবেদনকারীকে ১০ টাকা জমা দিতে হবে। যেমন, ওই অ্যাকাউন্ট বেলঘরিয়া থেকে বারাসত কিংবা কলকাতা থেকে কুচবিহারে স্থানান্তর (ট্রান্সফার) করতে চাইলে পাশবই-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট ফর্ম SB10(b) পূরণ করে পোস্ট অফিসে জমা দিতে হবে।

সেভিংস সার্টিফিকেট

ব্যাংকের ফিক্সড্ ডিপোজিট-এর মতো ডাকঘর থেকে সেভিংস সার্টিফিকেট (অর্থাৎ ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট বা কিষাণ বিকাশ পত্র) কেউ কিনতে চাইলে যে কোনও কাজের দিন, নির্দিষ্ট কাজের সময়ের মধ্যে তা কেনা যায়। আবার সেভিংস সার্টিফিকেট ট্রান্সফার করতে চাইলে ডাকবিভাগের নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হয়। অর্থাৎ কেউ যদি দিল্লির কনট্ প্লেস থেকে সার্টিফিকেট কেনেন, পরবর্তীকালে বদলি হয়ে এলেন কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে, তিনি আবেদনপত্রটি কনট্ প্লেস ডাকঘর অথবা কাঁকুড়গাছি ডাকঘরে জমা দেবেন। ওই আবেদনপত্রটি, যে ডাকঘর থেকে সেভিংস সার্টিফিকেট কেনা হয়েছে সেখান থেকে যাচাই হয়ে আসার পর ট্রান্সফার বলবৎ হবে। এক্ষেত্রে টাকা ভাঙানোর জন্যও কোনও অসুবিধা নেই। এই সেভিংস সার্টিফিকেট হারিয়ে গেলে ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। এর জন্য সার্টিফিকেট পিছু নির্দিষ্ট ফি ৫ টাকা।

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট বা কিষাণ বিকাশ পত্র বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার সুবিধাও আছে। তবে ঋণ পরিশোধের পর অসুবিধা এড়াতে নিয়ম মেনে চলতে হবে। ঋণ নেওয়ার আগে

সার্টিফিকেটের সমস্ত তথ্য ডাকঘর থেকে যাচাই করে জমা দিতে হবে। এর জন্য খুব সামান্য ফি লাগে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের দায়িত্ব হল ঋণ পরিশোধের পর ওই সার্টিফিকেট 'রিলিজ' করে সরাসরি গ্রাহককে প্রদান করা। গ্রাহক যখন পরবর্তীকালে সার্টিফিকেট নিয়ে পেমেন্ট-এর জন্য ডাকঘরে যাবেন তখন ডাকবিভাগকেও ওই 'রিলিজ' সম্পর্কে জানিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ডাকবিভাগকে সার্টিফিকেট 'রিলিজ' করে পাঠাবে এবং ডাকবিভাগ যথাযথ নোটিং-এর পর ওই সার্টিফিকেটের মূল্য গ্রাহককে ফেরত দেবে। সার্টিফিকেট ব্যাংকে জমা থাকাকালীন হারিয়ে গেলে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেটের জন্য ডাকঘরে আবেদন জানাতে হবে।

মাসিক আয় প্রকল্প

'মান্থলি ইনকাম স্কিমে' (মাসিক আয় প্রকল্প) উপভোক্তা টাকা রাখতে পারেন। এই টাকা রাখার ক্ষেত্রে নমিনি নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। কোনও কারণে উপভোক্তা মারা গেলে ক্লেম ফর্ম সহ সমস্ত তথ্যাদি দিয়ে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরে কাগজপত্র জমা করলে নমিনি ৭ দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন। যদি নমিনি না থাকে, সেক্ষেত্রে দাবিদার ৭ দিনের মধ্যে টাকা পাবেন।

জীবন বিমা

পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স (ডাক জীবন বিমা) বা পি এল আই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, সরকারি মালিকাধীন সংস্থা, স্থানীয় সরকার (পঞ্চায়েত), স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ডিফেন্স, প্যারা মিলিটারি ফোর্স, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বাণিজ্যিক ব্যাংক, ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর্মচারীরা করতে পারেন। একটা সময়ের পর এর উপভোক্তা যদি পি এল আই চালাতে না চান, তাহলে তিনি 'সারেন্ডার ভ্যালু' পেতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে উপভোক্তাকে পলিসি শুরুর সময় থেকে ৩৬ মাস বা তার বেশি একটানা প্রিমিয়াম জমা করতে হবে এবং যদি তিনি ৬০ মাস বা তার বেশি পলিসি চালু রাখেন তবেই আনুপাতিক বোনাস পাবেন। 'হোল লাইফ পলিসি'-র (আজীবন বিমা) ক্ষেত্রে অন্তত ৪৮ মাস বা তার বেশি একটানা প্রিমিয়াম জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রেও ৫ বছর পূর্ণ না হলে বোনাস পাবেন না। এই পি এল আই-এর মাধ্যমে উপভোক্তা নিজের পলিসি জমা রেখে কিছু শর্ত সাপেক্ষে ঋণ পেতে পারেন। এক্ষেত্রে আসল পি এল আই পলিসিটিকে হস্তান্তর করতে হবে। নির্ধারিত 'লোন ফর্ম'-এ এই আবেদন করতে হবে। সেই সঙ্গে আসল 'প্রিলিমিনারি রিসিট বুক' দিতে হবে (পে পলিসি ব্যতীত)। ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আজীবন পলিসি ৪ বছর বা তার বেশি এবং এনডাওমেন্ট পলিসি ৩ বছর বা তার বেশি একটানা প্রিমিয়াম জমা দিতে হবে। সমস্ত কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকলে ১০ দিনের মধ্যে পি এল আই পলিসি থেকে ঋণ পাওয়া সম্ভব। উপভোক্তা এই পি এল আই পলিসির মাধ্যমে কো-অপারেটিভ (সমবায়) ব্যাংক বা অন্য কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে পলিসি শুরুর সময় থেকে অন্তত ৩ বছর (আজীবন পলিসির ক্ষেত্রে ৪ বছর) পূর্ণ হওয়ার পর 'সারেন্ডার ভ্যালু' অনুযায়ী ঋণ পাবেন। তবে 'অ্যান্টিসিপেটেড এনডাওমেন্ট অ্যাসিওরেন্স', ১০ বছরের রুরাল (গ্রামীণ) পি এল আই এবং চিল্ড্রেন পলিসির ক্ষেত্রে এই সুযোগ পাওয়া যায় না।

পলিসি কখনও ল্যাপ্স (তামাদি) হয়ে গেলে উপভোক্তা শুধুমাত্র 'সারেন্ডার ভ্যালু' (জমাকৃত রাশির আনুপাতিক হার অর্থাৎ সারেন্ডার ফ্যাক্টর) পাবেন। যদি পলিসিটি শুরুর সময় থেকে একটানা ৩৬ মাস বা তার বেশি চলে উপভোক্তা সারেন্ডার ভ্যালুর সঙ্গে আনুপাতিক বোনাস তখনই পাবেন যদি পলিসিটি ৬০ মাস বা তার বেশি চালু থাকে।

পি এল আই-এর ক্ষেত্রে যে সমস্ত পলিসিতে নমিনি করা আছে এবং পলিসিটি একটানা ৩৬ মাস বা তার বেশি চলেছে সেক্ষেত্রে উপভোক্তা মারা গেলে সম্পূর্ণ দাবিপত্র পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পলিসির মূল্য ও আনুপাতিক বোনাস পাওয়া যায়।

সুদ পাওয়ার নিয়ম

ডাকঘরে টাকা জমা রাখলে আর্থিক বছর শেষ হলে জমা টাকার ওপর সুদ পেতে উপভোক্তার প্রায় ২-৩ বছর লেগে যেত বলে আগে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সমস্ত ডাকঘরে কম্পিউটার পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে আর্থিক বছর শেষে নিয়মিত সুদ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর্থিক বছরের শেষে সুদ দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় হল ১ মাস।

অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি

ডাকবিভাগের সমস্ত স্তরে অর্থাৎ চিফ্ পোস্ট মাস্টার জেনারেল-এর অফিস থেকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর অফিস পর্যন্ত জন-অভিযোগ শাখা আছে। সেখানে লিখিত আকারে অভিযোগ জানানো যায়। এছাড়া অনলাইনেও (www.indiapost.gov.in অথবা www.pgportal.gov.in) অভিযোগ দায়ের করা যায়। অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কম্পিউটার পরিচালিত গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র (কাস্টমার কেয়ার সেন্টার) তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য চিফ্ পোস্ট মাস্টার জেনারেল-এর নেতৃত্বে প্রতি ৩ মাস অন্তর 'ডাক আদালত' অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষতিপূরণ

ডাকবিভাগের পরিষেবায় ঘাটতি প্রমাণিত হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি চালু আছে। তদন্তের শেষে তা নির্ধারিত হয়। সেক্ষেত্রে গ্রাহককে বুকিং অফিসে অভিযোগ জানাতে হবে। পাশাপাশি গ্রাহক উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরেও অভিযোগ জানাতে পারেন। সেক্ষেত্রে পরিষেবায় ঘাটতি ঘটার দু'বছরের মধ্যে অভিযোগ জানাতে হবে। ওই দপ্তরের ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকারের তত্ত্বাবধানে সালিশির মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি না হলে উপভোক্তা ফোরামে অভিযোগ জানানো যায়। পরিষেবায় ঘাটতি প্রমাণিত হলে, উপভোক্তা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন।❑

প্র | তি | যো | গি | তা | প্র | স্তু | তি

গবেষণার জন্য বৃত্তি

মহুয়া গিরি

পছন্দের বিষয়ে গবেষণা করতে চান? এক্ষেত্রে সরকারি (এবং বেসরকারি) উদ্যোগে ব্যবস্থা রয়েছে আর্থিক অনুদানের একেকটা স্কলারশিপ বা বৃত্তির একেক রকম শর্ত, একেক রকম সুবিধা। খোঁজখবর না নিয়ে খুঁটিনাটি না জেনে এগোলে কিন্তু বিপদে পড়তে হতে পারে। সেসব ব্যাপারে 'ইন্টারনেট' ঘেঁটে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 'ওয়েবসাইট' দেখে একটু জেনে নিলে আখেরে লাভ নিজেরই। বেশিরভাগ পড়ুয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়াতে পড়তে যেতে বেশি আগ্রহী। সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড এমনকী আমাদের ঘরের পাশে সিঙ্গাপুর আর হংকং-এও রয়েছে নানা ধরনের বৃত্তি আর গবেষণা করার সুযোগ। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর স্তরে ও গবেষণা ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) অনুমোদিত একাধিক বৃত্তি রয়েছে। তবে আবেদনকারীর যোগ্যতা ভিন্ন। আজকের দিনে তথ্যই শক্তি। তথ্যই আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার অস্ত্র। দেশে বিদেশে বৃত্তি ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে যার কাছে তথ্য যত বেশি সে-ই আগামী দিনে এগিয়ে যাবে।

বৃত্তি তো নানা ধরনের হয়। খুঁজতে হবে পরিকল্পনামাফিক। প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে ঠিক কী ধরনের পড়াশোনা বা গবেষণার ক্ষেত্রে কেউ এগোতে চাইছেন। সেই বিষয়টি দিয়েই শুরু করুন। স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পোস্ট ডক্টরাল কিংবা ডিগ্রিবিহীন কোনও স্কলারশিপ—কীসের জন্য আবেদন করবেন সে ব্যাপারে মনস্থির করে নিতে হবে। জেনে নিন কোনটার বা কোন বৃত্তির কী কী শর্ত, কী কী সুবিধা। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যেখানে সুবিধা সবচেয়ে বেশি সেটা ধরেই এগোনো উচিত।

আজকে তো দিকে দিকে শিক্ষামেলা, যাকে বলি, 'এডুকেশন ফেয়ার'। এই মেলাগুলি এইসব ব্যাপারে জানার জন্য একটা চমৎকার জায়গা। বিমানভাড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে বিশদ জানা যায় এখানে। খোঁজ নেওয়ার আরেকটা বড় জায়গা হল যে দেশে যাবেন তার 'কনস্যুলেট' বা দূতাবাস। কোনও দেশের দূতাবাস সে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির একটি নমুনা কেন্দ্র। এ ব্যাপারে কলকাতার একটা চেনা ঠিকানা হল ব্রিটিশ কাউন্সিল। আর একটা পরিচিত জায়গা হল আমেরিকান সেন্টার। গ্রেট ব্রিটেন কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যেতে চাইলে এখানকার সংশ্লিষ্ট অফিসার ও কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আমেরিকান সেন্টারে তো সপ্তাহে একদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে বা গবেষণা করতে যেতে আগ্রহীদের জন্য আলোচনার বা 'কাউন্সেলিং'-এর ব্যবস্থা আছে। আলোচনা এবং পরামর্শের ফলে ওই দেশের কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী পড়বেন সে ব্যাপারে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে নেওয়া যায়। কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবন কিংবা গোর্কি সদনেও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে পড়াশোনা সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যায়।

ধাপে ধাপে এগোন। শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাছাই শেষ হওয়ার পর জানতে হবে সেখানে কী কী বৃত্তি রয়েছে আর কোনটার জন্য আপনি যোগ্য। তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত দপ্তরে (ফিনান্সিয়াল এইড অফিস) যোগাযোগ করা যায়। একটু আগেভাগে খোঁজ নেওয়াই ভালো। কারণ বহু প্রতিষ্ঠানেই ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় কিংবা ভর্তির আগের বছরেই আবেদনপত্র গ্রহণের পর্ব শেষ হয়ে যায়। যেমন, হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পরবর্তী গবেষণার জন্য মোটা অঙ্কের সে স্টাইপেন্ড বা বৃত্তি রয়েছে তার জন্য আবেদনকারীকে নিজের গবেষণার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিতে হয়। যাকে বলে 'লেটার অব ইন্টারেস্ট'। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগ্যতার পরিচয়পত্র বা 'রেজিউমে' পাঠাতে হয় ডিসেম্বরের মধ্যে। এটা কিন্তু মোটেই দরখাস্ত নয়। তবে আবেদনপত্রের আগে সব পাঠানো বাধ্যতামূলক। তা না হলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না। যেমন সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যালগরিদম-এ সহকারী গবেষক বা পিএইচডি-এর জন্য আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে রেজিউমে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবেদনকারীর আগ্রহপত্র। না হলে আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে। এই তথ্যটুকু জানা না থাকলে সব চেষ্টাই বিফলে যেতে পারে।

বৃত্তির জন্য আবেদন করার আগে গবেষণার মেয়াদ সম্পর্কে জানাটাও একটা জরুরি ব্যাপার। দীর্ঘমেয়াদি বৃত্তির পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদি বৃত্তির জন্যও আবেদন করা যায়। বিদেশে পড়াশোনার জন্য অনেক ধরনের স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যাঁরা দেশেই উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করতে চান তাঁদের জন্য সরকারি তরফে রয়েছে একাধিক বৃত্তির সুযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন স্বীকৃত যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এই বৃত্তিগুলির জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে তার আগে দেখে নিতে হবে

আবেদনকারীর যোগ্যতার শর্তগুলি কী কী। কখনও বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা, ডিগ্রি বা বয়সসীমাই যোগ্যতার মাপকাঠি হয়। যোগ্যতার নিরিখে বৃত্তিপ্রাপকদের তালিকা তৈরি হয়। তাই আবেদনের আগে এই সমস্ত খুঁটিনাটি দেখে নেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অনুমোদিত উচ্চশিক্ষার জন্য এমনই কিছু বৃত্তি আমরা আলোচনা করব এই নিবন্ধে।

● পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ (মহিলাদের জন্য) :

পিএইচডি ডিগ্রি আছে এমন মহিলা যাঁরা এখনও চাকরিতে যোগ দেননি, তাঁদের পছন্দের বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ দিতে এই ফেলোশিপ চালু হয়েছে। এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে গেলে আবেদনকারীর ডক্টরেট ডিগ্রি এবং প্রকাশিত গবেষণাপত্র থাকা জরুরি। এছাড়া স্নাতক স্তরে অন্তত ৫৫ শতাংশ ও স্নাতকোত্তরে ৬০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। তবে সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য ছাড় আছে। সেক্ষেত্রে পড়ুয়া স্নাতকস্তরে ৫০ শতাংশ ও স্নাতকোত্তরে ৫৫ শতাংশ নম্বর পেলেই আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীর বয়স (আবেদনবর্ষের ১ জুলাই-এর মধ্যে) সাধারণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৫৫ বছর এবং সংরক্ষিত শ্রেণির (তপশিলি জাতি, উপজাতি, অনুন্নত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী) ক্ষেত্রে ৬০ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

● স্বামী বিবেকানন্দ সিঙ্গল গার্ল চাইল্ড স্কলারশিপ ফর রিসার্চ ইন সোশ্যাল সায়েন্স :

এমফিল বা পিএইচডি স্তরে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে মেয়েদের গবেষণায় উৎসাহ দিতে এই স্কলারশিপ চালু হয়েছে। সমাজে লিঙ্গবৈষম্য কমাতে, আন্তর্জাতিক স্তরে নারী-পুরুষের সাম্য বজায় রাখতে, নারী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বৃত্তি চালু করা হয়। আবেদনকারী কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে পারলে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। শর্তগুলি হল আবেদনকারীকে পিতামাতার একমাত্র সন্তান (কন্যা) হতে হবে। কোনও ভাই বা বোন থাকলে আবেদন গ্রাহ্য হবে না। তবে যমজদের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ছাড় আছে। আবেদনকারীকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন স্বীকৃত কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিভুক্ত নিয়মিত পাঠ্যক্রমের (রেগুলার কোর্স) পড়ুয়া হতে হবে। দূর শিক্ষার পড়ুয়াদের জন্য এই বৃত্তির কোনও সুবিধা নেই। বয়সসীমা সাধারণের ক্ষেত্রে ৪০ ও সংরক্ষিত শ্রেণির ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত।

● জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি :

এখন মাস্টার অব টেকনোলজি (এমটেক), মাস্টার ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (এমই) বা মাস্টার ইন ফার্মাসি (এমফার্ম)-তে পিএইচডি বা গবেষণার সময় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ পেতে গেলে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট বা নেট পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী বেছে নেয়। প্রতি বছর মোট ৫০ জন পড়ুয়াকে এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়। তবে আবেদনকারী পড়ুয়াকে ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমটেক (মাস্টার অব টেকনোলজি), এমই (মাস্টার ইন ইঞ্জিনিয়ারিং) বা এমফার্মে (মাস্টার ইন ফার্মাসি) উত্তীর্ণ হতে হবে। আবেদনের সর্বাধিক বয়সসীমা ৪০ বছর। তপশিলি জাতি-উপজাতি এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে আরও ৫ বছর ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। এই বৃত্তির মেয়াদ ৫ বছরের বেশি নয়। প্রথম দুই বছর 'জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ' ও পরের ৩ বছর উৎকর্ষের বিচারে উত্তীর্ণ হলে 'সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ' দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে বৃত্তির অর্থমূল্যও বাড়ে।

● মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর মাইনরিটি স্টুডেন্ট :

মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, পারসি এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের [ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিস অ্যাক্ট, ১৯৯২-এর সেকশন ২(সি) ধারা অনুযায়ী] ছেলেমেয়েরা এমফিল (মাস্টার অব ফিলোজফি) বা পিএইচডি (ডক্টর অব ফিলোজফি)-স্তরে এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে কেবলমাত্র নিয়মিত পাঠক্রম বা রেগুলার কোর্সের পড়ুয়ারাই এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে যাঁরা এই বৃত্তি পাবেন তাঁরা একই পাঠক্রমের জন্য অন্য কোনও সরকারি বৃত্তির সুবিধা নিতে পারবেন না। যদিও গবেষণার কাজে উৎসাহ দিতেই এই বৃত্তি, তবে তার জন্য 'ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট' (নেট) বা 'স্টেট লেবেল এলিজিবিলিটি টেস্ট' (স্লেট) উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক নয়। তবে স্নাতকোত্তর স্তরে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পাওয়া জরুরি। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগের একটি উদ্যোগ। মূল উদ্দেশ্য পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু জনজাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এই বৃত্তির মেয়াদ সর্বাধিক পাঁচ বছর।

● রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর এসসি, এসটি ক্যান্ডিডেট :

তপশিলি জাতি বা উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা স্নাতকোত্তরের পর এমফিল বা পিএইচডি স্তরে গবেষণার জন্য এই বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে দূর শিক্ষা পাঠক্রম (ডিসটেন্স লার্নিং)-এর পড়ুয়ারা এই বৃত্তির আওতাধীন নন। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে পিছিয়ে পড়া তপশিলি জাতি ও উপজাতিকে সমাজের মূলস্রোতে টেনে আনতে, উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ দিতেই এই স্কলারশিপের আয়োজন। যোগ্যতার নিরিখেই বৃত্তিপ্রার্থীদের বেছে নেওয়া হয়। সামাজিক ন্যায় ও অধিকারমন্ত্রক (মিনিস্ট্রি অব সোশ্যাল জাস্টিস অ্যামড এমপাওয়ারমেন্ট) এবং উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রক (মিনিস্ট্রি অব ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স)-এর কর্তৃক এই বৃত্তির জন্য অর্থ অনুমোদন করা হয়। বিজ্ঞান, কলা, সমাজবিদ্যা কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বা ফার্মাসি—যে কোনও একটিতে এমফিল ও পিএইচডি-র গবেষণার জন্য এই ফেলোশিপের আবেদন করা যায়। প্রতি বছর মোট ২০০০ তপশিলি জাতিভুক্ত ও ৬৬৭ জন উপজাতির পড়ুয়াদের এই বৃত্তি দেওয়া হয়।

● পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ টু এসসি, এসটি ক্যান্ডিডেট :

তপশিলি জাতি, উপজাতির পড়ুয়াদের পোস্ট ডক্টরাল স্তরে এই বৃত্তি দেওয়া হয়।

বিজ্ঞান, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার জন্য এই বৃত্তির জন্য আবেদন করা যায়। তবে যোগ্যতা হিসেবে দেখা হয়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবেদনকারীর ডক্টরেট ডিগ্রি ও প্রকাশিত গবেষণাপত্র আছে কি না। বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী যোগ্যতার ভিত্তিতেই যোগ্যতম প্রার্থীদের বেছে নেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৫০ বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৫৫ বছর (আবেদনবর্ষের ১ জুলাই-এর মধ্যে) বয়স অবধি এই বৃত্তির জন্য আবেদন করা যায়।

● ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর ওবিসি ক্যান্ডিডেট :

'আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস' (ওবিসি) বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত পড়ুয়া, যাঁরা এমফিল বা পিএইচডি-তে আগ্রহী তাঁদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই বৃত্তি চালু করেছে। বিজ্ঞান, কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিভাগের পড়ুয়ারাই গবেষণার ক্ষেত্রে এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে আবেদনকারীকে নিয়মিত পাঠ্যক্রমের পড়ুয়া হতে হবে। প্রতি বছর মোট ৩০০ জন ওবিসি পড়ুয়াকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। তবে এর মধ্যে ওবিসি শ্রেণিভুক্ত প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের জন্য ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। আবেদনের সময় আবেদনকারীকে পরিবারের বার্ষিক আয় দেখাতে হয়। সেখানে বাবা-মা কিংবা অভিভাবকের বার্ষিক আয় ৬ লক্ষ টাকার বেশি হলে আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

● রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর স্টুডেন্ট উইথ ডিজেবিলিটি :

মেধাবী প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের গবেষণার জন্য উৎসাহ দিতে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বৃত্তি চালু করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগে প্রতিবন্ধী পড়ুয়ারা জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্তরে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তো পাবেই তাছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবেও যোগ দিতে পারবেন। এই বৃত্তির জন্য আবেদনকারীকে কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। এমফিল বা পিএইচডি স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্তকরণের পরেই এই বৃত্তি দেওয়া হয়। প্রথম দুই বছরের পর গবেষণার কাজ কতটা সন্তুষ্টিজনক তার ওপরেই নির্ভর করে পরের বছরগুলিতে বৃত্তি পাওয়া যাবে কি না। এই বৃত্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বৃত্তিপ্রাপকরা অন্য কোনও সরকারি স্কলারশিপ বা ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

● ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণন পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ ইন হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (ইনক্লুডিং ল্যাঙ্গোয়েজ) :

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষায় পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রির জন্য খুব কম সংখ্যক গবেষকরাই চিন্তাভাবনা করেন। বিশেষ করে কলা বিভাগ ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে এ দেশের তুলনায় বিদেশে ডক্টরেট পরবর্তী গবেষণার ঝোঁক বেশি। এই সমস্ত বিষয়গুলিতে দেশে উচ্চ গবেষণায় উৎসাহ দিতেই এই ফেলোশিপ চালু হয়। এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে গেলে আবেদনকারীর অবশ্যই ডক্টরেট ডিগ্রি থাকতে হবে। সাধারণ শ্রেণির ক্ষেত্রে স্নাতকস্তরে ৫৫ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ৬০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে (সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য স্নাতক স্তরে ৫০ ও স্নাতকোত্তরে ৫৫ শতাংশ)। নিয়মিত পাঠ্যক্রমের গবেষকরা ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেন।❑

তথ্য সূত্র : www.ugc.ac.in